

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পর্যটন বিচ্ছিন্ন

পড়তে পড়তে গন্তব্যে...



LET'S DAY OUT

রিভার ক্রুজ RIVER CRUISE



পিকনিক PICNIC

Your Events

Corpotate Outing

Annual Picnic & Cruise

School Day out

Social get-together

Corpotate Team Building

Our Services

Transportation

Spot Reservation

Vessel Reservation

Branding & Cultural Program

Meals, Fun & Entertainment



RIVER AND GREEN TOURS

House-97/1, Flat-2B, Sukrabad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207. Bangladesh

E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com

www.riverandgreen.com

+88 01819224593, 01979224593

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର

ଅଢ଼ାତେ ଅଢ଼ାତେ ଗନ୍ଧ୍ୟୋ...

www.parjatanbichitra.com





সম্পাদকীয়

অনন্য সন্তাননাময় নদী পর্যটন

পর্যটন শিল্পের অফুরন্ত সত্ত্বার বাংলাদেশের নদী, সাগর, হাওড়, পাহাড়, প্রাচীন শিল্প এবং প্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতি ও অতিথিপরায়ন মানুষ। এতসব বৈচিত্রের পরও আমাদের পর্যটন শিল্প অর্ধশতাব্দী ধরে শৈশবকাল অতিবাহিত করছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবসমূহ এই জনপদ শত শত বছর আগে বিশ্ব পরিব্রাজকদের আকৃষ্ট করলেও বিশ্বায়নের এই যুগে আধুনিক পর্যটন বাজারে বাংলাদেশকে উপস্থাপনের কোশল আজও সেভাবে রচিত হয়নি।

বাংলাদেশ নদীমাত্রক দেশ। বাংলাদেশের এই পরিচিতি বা ব্র্যাণ্ডিং করে, কীভাব, কার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, তার কোনো ইতিহাস বা তথ্য জানা যায়নি। হয়তো কোনো ‘আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ‘নদীমাত্রক বাংলাদেশ’ সার্বজনীনভাবে সমাদৃত হয়ে পরিচিতি লাভ করেছে।

আমাদের নদী পর্যটনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলের মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উপভোগ করতে এসেছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, নিকোলাস পিজেন্টে ও লুইস, কাইশ্যার ফ্রে ডরিক, মাহয়ান, হিউয়েন সাং, ফা হিয়েন প্রমুখের মতো বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটকরা। তারা এই দেশে এসেছিলেন মানুষকে জানতে, মানুষের বিশ্বায়ক প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতাকে দেখতে। তারা নদীবক্ষে ভেসে ভেসে এই দেশের সভ্যতা কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। সে সকল পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী শুধু পর্যটন শিল্পের জন্য নয়, আমাদের এই বঙ্গের গৌরবময় ইতিহাস বিনির্মাণের সমৃদ্ধ ভাগ্নার।

ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমলের অস্তিম কাল পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ বন্দর ছিল অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবেশের প্রধান ঘাট। তৎকালীন বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য নদীপথই ছিল প্রধান। সে সময়ের উন্নেখযোগ্য নৌপথগুলোর মধ্য ছিল- নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর হয়ে পদ্মা নদী পথে জগন্নাথগঞ্জে বাহাদুরাবাদ ঘাট; গোয়ালন্দ থেকে আরিচার কাছে কাঞ্চনপুর হরিরামপুরের জালালী ঘাট; নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর বরিশাল হুলারহাট মোড়লগঞ্জ হয়ে খুলনা; আর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী পথ ছিল নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর গোয়ালন্দ জগন্নাথগঞ্জ সিরাজগঞ্জ বাহাদুরাবাদ তিস্তামুখ ঘাট ফুলছড়ি হয়ে আসামের ধুবলি পর্যন্ত। সে সময় এই নৌপথে চলাচল করত ৪০ থেকে ৫০টি কয়লাচালিত প্যাডেল স্টিমার।

তখনকার দিনে উচ্চ শ্রেণির যাত্রীদের জন্য এসব প্যাডেল স্টিমার ছিল অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ নৌব্রহণ। মেটিভ হিসেবে বাঙালি ভ্রমণকারীর জন্য প্রথম শ্রেণির কেবিনে যাত্রী হওয়ার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। কেবলমাত্র সরকারি উচ্চ পদে চাকরির অথবা অত্যন্ত আভিজাত শ্রেণি হিসেবে ব্রিটিশদের কাছে স্থীরতি পেয়েছে, এমন কিছু বাঙালির জন্য প্যাডেল স্টিমারের প্রথম শ্রেণিতে যাতায়াতের সুযোগ মিলত। প্রথম শ্রেণির সাজানো সেলুনে পাতা থাকতো পাহাড়ি বেতের তৈরি গার্ডেন চেয়ার, যেখানে বসে প্রাক্তিক দৃশ্য, নদীর প্রবাহ, বাহারি সুস্নাদু খাবার উপভোগ ছিল এক রাজকীয় আয়োজন।

পাকিস্তান আমলে রকেট স্টিমার প্রথম শ্রেণির চাকচিক্য আভিজাত্যে ব্রিটিশ আমলের মতো আতটা ভালো না হলেও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাবেক আমলের ধারাবাহিকতা বহাল রেখেছিল। বিদেশি রাষ্ট্রীয় মেহমান পাকিস্তান সফরে এলে ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত সরাসরি রকেট স্টিমারে এসে, খুলনার বিখ্যাত জুটিমিল, নিউজপ্রিন্ট মিল এবং শিপ ইয়ার্ড পরিদর্শনের পর সুন্দরবন ভ্রমণ ছিল অবধারিত।

শত বছরের ঐতিহ্যবাহী যে কয়টি প্যাডেল স্টিমার তার অবয়ব নিয়ে আজও বাংলাদেশে টিকে আছে তার মধ্যে টার্ন, মাউন্ট, অস্ট্রিচ, লেপচা উন্নেখন্যেগ্য। পালটে গেছে কয়লাচালিত বাঞ্ছইজিন, সেবার মান, শ্রীহীন হয়ে প্রায় ধূঃসের মুখোমুখি এসব ঐতিহ্যবাহী জাহাজ। আজও দু-একটি প্যাডেল স্টিমার চলছে ঢাকা বরিশাল, হুলারহাট, মোরগঞ্চ বা খুলনার পথে অথচ পর্যটন দণ্ডরের জোরালো উদ্যোগ থাকলে নদী পর্যটনের একটি বিলাসী পণ্য হিসেবে এই হেরিটেজ ক্রুজ বিশেষ সমান্বিত হতে পারত।

অতীতে এই অঞ্চলে সহস্রাধিক নদ-নদী থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন গবেষকের মতে, নদীর সংখ্যা ২৪৬ বা ২৮০, আবার কাঠো মতে নদী, উপনদী, শাখা নদী সব মিলিয়ে ৭১০টি হলেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১ সালের গবেষণায় ৪০৫টি নদীর উন্নেখ রয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ এই ছোট বড় নদী সংযোগে সংযুক্ত। আর এটিই নদীমাত্রক বাংলাদেশের মূল শক্তি।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এই সমতল অঞ্চলের নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীকেন্দ্রিক। এই অঞ্চলে প্রাচীন নগর সভ্যতার কেন্দ্রগুলো যেমন- নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্নানগড়, কুমিল্লার লালমাই, ময়নামতি ইত্যাদি অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল। প্রায় পাঁচ শত বছরের পুরোনো মেঝানা ও শীতলক্ষ্যের সঙ্গমস্থলের পাশে গড়ে উঠেছিল নরসিংহনীর উয়ারী বটেশ্বরের নগর সভ্যতা।

বর্তমান সময়েও বাংলাদেশের উন্নেখযোগ্য পর্যটন গন্তব্যগুলো নদী, সাগর ও হাওড়কেন্দ্রিক। যেমন- সুন্দরবন, কক্ষবাজার, সেন্ট মার্টিন, মেশখালী, নিয়ুম দ্বীপ, ভাসমান বাজার, রাতারগুল, বিছানাকান্দি, টঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি। সে বিচেনায় নদী পর্যটনের তেজন কোনো অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি, সরকারি কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয় এবং ভবিষ্যৎ কোনো পরিবর্জনাও জানা নেই।

এখনো নদীতে ভেসে আপনি উপভোগ করতে পারেন নদীর জীববৈচিত্র্য, শুশ্রেষ্ঠতা নৃত্য, ভোঁড় দিয়ে মাছ ধরা। এছাড়া নদীতে যেতে যেতে দেখতে পাবেন মাছ ধরার নানা কোশল। কেউ বাঁশের খাঁচা বানিয়ে মাছ ধরছে, কেউ বড়শি ফেলে, কেউ বাজা জাল ফেলে। জালের আবার নানা ধরন রয়েছে যেমন- ধর্ম জাল, বাঁকি জাল, ইলিশের জাল, কইয়া জাল ইত্যাদি। বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে এর নাম আবার ভিন্ন ভিন্ন। মাছ ধরার কোশল ভেদে আবার নৌকার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের দেশবন্দিন জীবন-যাত্রায় নানা ধরনের নৌকার ব্যবহার রয়েছে। যেমন- ডিঙ্গি, ডোংগা, কোষা, বজরা, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় এই নদী। নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের কর্মকাণ্ড, অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক। নদীর প্রবাহের একই সূত্রে গাঁথা তাদের জীবন প্রবাহ। নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে অনেক হাট-বাজার, উৎসব ও মেলা। নদীকেন্দ্রিক অনেক উৎসব যেমন- নৌকা বাইচ, দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জন, গঙ্গা মান, দুবলার চরে রাসমেলা ইত্যাদি পর্যটকদের আকর্ষণীয় ইভেন্টে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ ঝাতু বৈচিত্র্যের দেশ। ঝাতু বৈচিত্র্যের সাথে সাথে নদীর প্রবাহমানতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। বর্ধার নদী, শীত ও গ্রীষ্মের নদী যেন একই অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আবার সকালের সূর্যোদয়ের নদী, দুপুরে প্রথর রোদে, সন্ধ্যার সূর্যাস্তের আবহে নদীর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ভৱা পুর্ণিমার জ্যোত্স্না রাতের নদী যেন অবশ্যীয় নেসর্গিক আবহ। বৈচিত্র্যময় আমাদের নদীর সৌন্দর্য। পর্যটকদের জন্য নৌভ্রমণে এমন আকর্ষণ একটি বিবর অভিজ্ঞতা। যথাযথ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে, বিশ্ব পর্যটন বাজারে এর যথার্থ বিপুল করতে পারলে বাংলাদেশের নদী পর্যটন অনন্য উচ্চতা স্পর্শ করবে এবং পর্যটন শিল্পে নতুন স্বত্ত্বাবনার ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে।

নৌ পর্যটনের উন্নয়ন সত্ত্বে হলে নদীর অর্থনৈতিক ব্যবহার বেড়ে যাবে, নদীকেন্দ্রিক উৎসব ও স্বানীয় শিল্প-সংস্কৃতি সংরক্ষিত হবে। পর্যটন, নদী সম্পদ ও সংস্কৃতিবিষয়ক ব্যাপক কর্মসংহানের সুযোগ তৈরি হবে এবং তারিবাতী গ্রামগুলোর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। আমাদের নদী সম্পদ যথার্থভাবে ব্যবহৃত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সম্পাদক
মহিউদ্দিন হেলাল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
বার্ণা মহিউদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
মীর শামসুল আলম বাবু

গবেষণা
ড. মো. আতাউর রহমান
জিয়াউল হক হাওলাদার
সাহিদ হোসেন শামীম
ইমরান উজ-জামান

ফিচার
হোমায়েদ ইসহাক মুন
মার্জিয়া লিপি

ফেয়ার ও বাণিজ্য সম্পাদক
বোরহান উদ্দিন

হেত অব
মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন
সালাউদ্দিন অটন

বাণিজ্যিক নির্বাহী
মেহেদী হাসান
সোহেল মিয়া

সার্কুলেশন
আতিকুল মোল্লা

শিল্প নির্দেশক
নাজির খান খোকন

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. খোকন মিয়া
মো. আবু বক্র সিদ্দিক

বিদেশ সংযোগ
আশরাফুজ্জামান উজ্জল
জুন মুখাজী
শিমুল রহমান

সম্পাদকীয় কার্যালয়

বাণিজ্যিক কার্যালয়
বাড়ি ৯৭/১, ২য় তলা (২-বি)
গুলামগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ফোন : +৮৮০২-২২২২৪২৯৪৪

ইমেইল : parjatanbichitra@gmail.com

info@parjatanbichitra.com

ওয়েব : www.parjatanbichitra.com

নির্বাহিত কার্যালয়

এমআর সেন্টার (৭ম তলা) বাড়ী-৪৯
রোড-১৭ বনানী বা/এ, ঢাকা-১১২৩
বাংলাদেশ

প্রকাশক ও সম্পাদক মো. মহিউদ্দিন হেলাল কর্তৃক সম্পাদকীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং টেকমি প্রিন্টার্স প্রেস
২৬৭/জি, কমিশনার গলি, ফকিরাপুর, মতিবিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

কপিরাইট © পর্যটন বিচিত্রা

পর্যটন বিচিত্রা-এ প্রকাশিত কোনো লেখা ও তার কোনো অংশ প্রকাশক ও সম্পাদকের নিয়ে অনুমতি ব্যতীত
মুলে বা অন্যান্যে প্রকাশ করা যাবে না।



পর্যটন বিট্টা

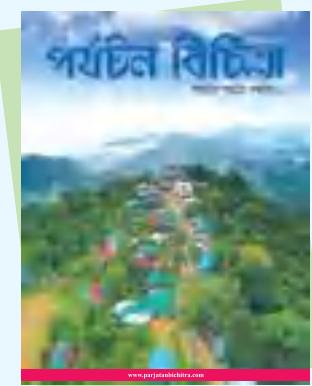
ফেব্রুয়ারি ২০২৩



টেকসই পর্যটন উন্নয়ন: সুন্দরবন প্রেক্ষিত ▶ ২৫



শীতের টাঙ্গুয়ার হাওড় ▶ ১১



প্রচ্ছদ: সাজেক ভ্যালি



ঘুরে আসুন ভুবর্গ কাশীয়ার ▶ ৬২

আরও যা থাকছে এই সংখ্যায়—

শেকড়ের টানে বাংলাদেশে	০৫
উত্তরের শীত	০৯
শীতের পিঠা পায়েস	১৪
দুই চাকায় হিজল বনের খোঁজে	১৬
সোনার চরে ক্যাম্পিং	১৭
সবুজ পাহাড়ের রাজ্য সাজেক ভ্যালি	১৯
ঘুরে আসুন বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর	২১
অমগ্নি আপনার প্রস্তুতি	২৩
বারদী পর্যটন কেন্দ্র	২৪
উত্তরবঙ্গের পর্যটন: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	২৯
ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র সৈকতে	৩৪
হিমালয়ের ঐতিহ্য	৩৭
মিয়ামি বিচে	৪১
আমেরিকার কয়েকটি বর্ষিল মুহূর্ত	৪৩
অটোয়ার শীত	৪৭
ঘুরে এলাম সুইডেনমার্ক	৪৯
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-সোফিয়া লরেনের দেশে	৫৩
গরমের দেশে শীতের কামড়!	৫৮

শেকড়ের টানে বাংলাদেশে

■ পর্যটন বিচিন্না প্রতিবেদন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের নানা যোগসূত্র রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে রয়েছে ভাষা ও শিকড়ের টান, রয়েছে উৎসব-পার্টিরের মিল। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বহু বাঙালি রয়েছেন যদের পূর্বপুরুষেরা এই বাংলাদেশে ছিলেন। দেশভাগের পর তারা কলকাতা চলে যান। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী এসব মানুষ কখনোই বাংলাদেশকে ভুলে যাননি।

শেকড়ের টানে তারা পূর্বপুরুষদের জন্মস্থানে ঘুরতে আসতে চান। আর তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে 'চলো বাংলাদেশ' নামে একটি অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রিভার অ্যান্ড গ্রিন টুররস।

নষ্টালজিক বা ইমোশনাল টুরের অংশ হিসেবে এবারও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৮ জনের একটি দল বাংলাদেশ ঘুরে গেল। এদের মধ্যে অধিকাংশ নারী-পুরুষের বয়স ৫০ এর ওপরে। কারোর বয়স ৮০ পর হয়েছে। তবে দৃঢ় ছিলেন তরুণ প্রজন্মের।

রিভার অ্যান্ড গ্রিন টুরসের আয়োজনে চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি তারা বাংলাদেশ অংশে আসেন। টানা ১৪ দিন বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কুষ্ঠিয়ার শিলাইদহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি, ছেউরিয়ায় লালমের মাজার, বরিশালে চারণ কবি মুকুন্দ দাস ও কবি জীবনানন্দ দাশের বসতভিটা, নারায়ণগঞ্জের পানাম সিটি, সেনাবাগাঁওয়ের ফোকলোর জাদুঘর, ঝুপগঞ্জের রূপসী জামদানি গ্রাম, মুরাপাড়া জিমিদার বাড়ি, কুঁজে শীতলক্ষ্ম্য অমল, পুরান ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দির, বাবা লোকনাথ আশ্রম, আহসান মঞ্জিল, শাখরাই পটি, কেন্দ্ৰীয় শহীদ মিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন ইল, মধু দা'র ক্যান্টিন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজার, জাতীয় জাদুঘর, কুমিল্লার প্রতাত্তিক নির্দশন, চট্টগ্রামের কেবলাধাম আশ্রম, চট্টেশ্বরী কালী মন্দির, প্রীতিলাতা ওয়াদেদারের বাড়ি, কক্ষবাজার সমুদ্র সেকেত, রাঙামাটির কাষ্ঠাই লেক ও সাভার জাতীয় স্মৃতিস্মূর্তি।

বাংলাদেশের যোগসূত্রে ভারতে অনেক বেণেগ বাঙালি রয়েছেন। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। কবিশুরু দুই বাংলায় সমানভাবে জনপ্রিয়। কলকাতার এই পর্যটক দলটি প্রিয় কবির স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি ঘুরে দেখেন। কবির ব্যবস্থাত বিভিন্ন জিনিসপত্র ও দুর্লভ কিছু ছবি দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন।

তারা মরমি কবি সাধক লালন ফকির লালন বা সঁইঁঁবির আখড়াতেও যান। সেখানে এই বাউল সাধকের স্মৃতিবিজড়িত জায়গা ঘুরে দেখার পাশাপাশি ফকিরদের গান বাজনা শুনেন।

বরিশালে চারণ কবি মুকুন্দ দাস ও কবি জীবনানন্দ দাশের বসতভিটা ঘুরে দেখেন। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখে ১৭ জানুয়ারি ঢাকা ত্যাগ করেন। বাপ-দাদার নষ্টালজিক বাংলাদেশে ঘুরতে এসে তাদের কেমন অনুভূতি হয়েছে সেসব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন পর্যটন বিচিন্নার কাছে।

রূপদত্ত চৌধুরী। বয়স ২৫। লেখাপড়া শেষ করে ফিল্যাঙ্গ ব্যবসা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় তার বাড়ি। তরুণ প্রজন্মের এই নারী এর আগেও বাংলাদেশে এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে এবারও পূর্ব



পুরুষদের সৃতিবিজড়িত বাংলাদেশে ঘূরতে এসেছেন। বাংলাদেশ ঘূরে কেমন লেগেছে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তিনি।
রূপদত্তা জানান, দ্বিতীয় বারের মতো তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। এর আগে ২০০৮ সালে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। তিনি থিয়েটার করেন। ঢাকা নাট্যোৎসবে এসেছিলাম। ওই উৎসবে তাদেরকে পারফর্ম করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তবে

পেরে, সেখানকার মানুষ দেখে, দাদা কোন স্কুল কলেজে লেখাপড়া করেছেন সেটা দেখে খুব ভালো লেগেছে।
শেকড়ের টানে দাদার সৃতিবিজড়িত জায়গায় যাওয়ার অনুভূতি প্রসঙ্গে রূপদত্ত বলেন, দাদুর জন্মস্থানে গিয়ে দাদুর কথা মনে পড়েছে। দাদু সব সময় বরিশাল নিয়ে গল্প করতেন। বরিশাল নিয়ে তিনি খুব গর্ব করতেন। বরিশালের লোকজন অনেক

পাইনি। তবে তার বসতভিটা যদি আরেকটু সংরক্ষণ করা যেত তাহলে ভালো হতো। তবে বাংলাদেশে এসে যে তার বসতভিটি দেখতে পেরেছি তাতেই অনেক ভালো লেগেছে। তবে এই দেশের মানুষের যে আন্তরিকতা, কখনো মনে হয়নি- অন্য কোনো দেশে এসেছি। মনে হয় নিজের মানুষের কাছেই এসেছি।

তিনি আরও বলেন, কলকাতায় আমাদের প্রজন্মের তরণ-তরণীরা, যাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় বাংলাদেশে ছিলেন, তারা এই দেশে আসার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী। সবাই সপরিবারে আসতে চায়। আমাদের প্রজন্মের অনেক ছেলে-মেয়ে, যাদের শেকড় বাংলাদেশে, তারা তাদের পূর্বপুরুষের কোথা থেকে এসেছে, সে বিষয়ে তারা খুব সচেতন।

আমাদের শেকড়ের টান্টা বাংলাদেশে, সেখানে বার বার আসার চেষ্টা করি।

বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি অমগ্নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এই তরণী বলেন, কুঠিয়ার শিলাইদহের গল্প অনেক শুনেছি। উনার লেখা ও চিঠিপত্রে শিলাইদহ, পদ্মাবোটের নাম বার বার উঠে এসেছে। সেসব জায়গা চাকুষ দেখার সময় গায়ে কাঁটা দিছিল। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে যে মিউজিয়ামটি হয়েছে, সেটা খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। খুব দুর্লভ কিছু ছবি আছে যা আমি আগে দেখিনি। সেই ছবিগুলো এখানে এসে দেখে ভীষণ ভালো লেগেছে।

লালনের আখড়ার বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা লালনগীতি গেয়ে থাকি। তার দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করে থাকি। তার যে জীবনকথা সেগুলো আমরা পড়াশোনা করেছি। তিনি যেখানে বেড়ে উঠেছেন, তার সেই জায়গা দেখে খুব ভালো লাগল। তার সৃতিবিজড়িত জায়গটা যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে তা দেখেও খুব ভালো লাগল। ওখানে ফকিরদেরে মুখে গান শুনে আরও ভালো লেগেছে।

রূপদত্ত বলেন, লালন ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন কোথাও গিয়ে এক হয়ে গেছে। দুজনই মানবতাবাদের কথা বলেছেন। দুজনই এক জায়গার। একজন কুঠিয়ার শিলাইদহে অন্যজন ছেউরিয়ায়। দুটি জায়গা এক সাথে দেখতে পেরে খুবই সেটিমেটাল লাগে।

ঢাকা ডিনার ক্রুজে অমগ্নের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কলকাতার এই তরণী বলেন, আজকে আমরা মন্টা ভীষণ খুশি। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ- এটা আমরা পড়েছি। আর এখন স্বচক্ষে দেখছি এবং অনুভব করছি। আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার কোনো তুলনা হয় না বাংলাদেশের মানুষের। কয়েক মিনিটের আলাপেই এখনকার মানুষ যেভাবে আমাদের আপন করে নিয়েছে, তা অকল্পনীয়।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রজন্মের যেসব তরণ-তরণীর পূর্বপুরুষদের শেকড় বাংলাদেশে ছিল তাদের বিষয়ে রূপদত্ত বলেন, আমাদের প্রজন্মের কারোর শেকড় হয় তো খুলনায়, কারো বরিশাল বা ফরিদপুর।

সুতরাং আমাদের প্রজন্মের লোকজন তারা বার বার বাংলাদেশে আসতে চায়। তারা দেখতে চায় তাদের পূর্বপুরুষরা কোথায় ছিলেন। তার দাদু কোন স্কুলে পড়তেন, কোন গ্রামে থাকতেন। সমগ্র বাংলাদেশ তারা ঘূরতে চায়।

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ পর্যটন ব্যবস্থা যত উন্নত হবে, বাংলার বাইরেও দিল্লি, গুজরাট, চেন্নাই, বেঙ্গালুরুকে যত শহর আছে সেসব জায়গা থেকে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে বাংলাদেশের প্রতি।

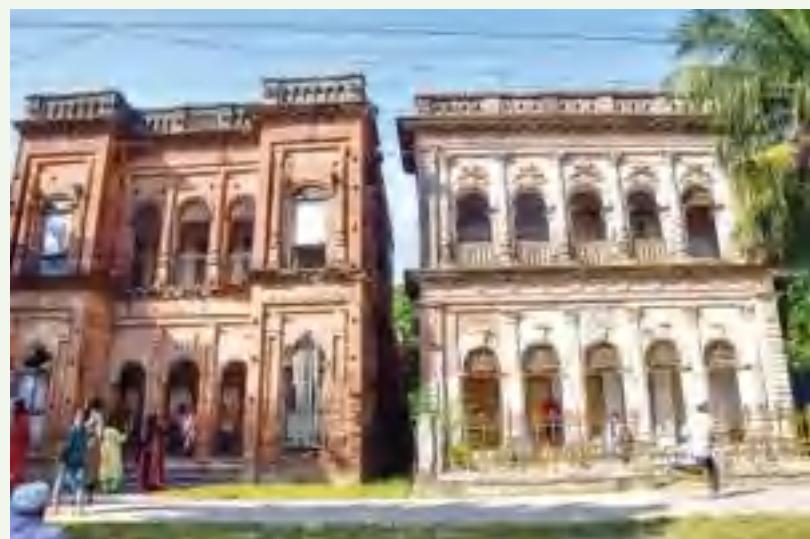
‘তারা আমার কাছে জানতে চেয়েছে- বাংলাদেশটা কেমন? বাংলাদেশটা তাদের স্বচক্ষে দেখার খুব ইচ্ছা। তারা কিন্তু বাংলাদেশে আসতে চাইছে।



সেবার ঘূরতে পারেননি বলে আফসোস করেন তিনি। এজন্য এবার শুধু ঘূরতে বাংলাদেশে এসেছেন। পুরো বাংলাদেশ ঘূরে দেখার ইচ্ছা তার। বাংলাদেশে এসে কেমন লাগছে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, সব জায়গায় ঘূরতে গেলে একটা স্বাভাবিক অনুভূতি কাজ করে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন। কারণ বাংলাদেশের সাথে একটা অন্যরকম সেন্টিমেটে জুড়ে থাকে যেমন- আমরা গল্প শুনেছি, আমার দাদুর বাড়ি বরিশাল ছিল। দাদির বাড়ি ঢাকা ছিল। তারা স্কুল পাস করে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। এখন সেখানে (বরিশাল) যেতে

সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত- এসব বিষয় দাদুর অনেক গল্পে প্রকাশ পেত। এটা এসে স্বচক্ষে দেখলাম। এরপর মুকুন্দ দাসের কালীবাড়িতে গিয়েছি। তার এই জায়গা ইতিহাসে পরিপূর্ণ, সেটা দেখে অসাধারণ লেগেছে।

এছাড়া জীবনান্দ দাশের কবিতা আমাদের পাথেয়। যারা আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে লেখাপড়া করি, জীবনের প্রতিটি ঘাতপ্রতিঘাত বা যে কোনো সময় উন্নার লেখা বা কবিতায় বার বার উঠে আসে। আমরা তাকে সব সময় স্মরণ করি। উন্নার বসতিভিটায় গিয়েছি। তবে লাইব্রেরিটা দেখতে



এজন্য পর্টিন ব্যবহা উন্নত হতে থাকবে সেখানকার লোকজনও আসতে থাকবে। সেই সাথে বাংলাদেশের খুব উন্নত হবে, বলেন রূপদত্ত।

পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্মকে বাংলাদেশ ভগমে

আহ্বান জানিয়ে এই পর্টিক বলেন, আসুন বাংলাদেশ

যুরে যান। মানুষের আন্তরিকতা কেমন সেটা এদেশে

একবার এলৈই বুবাতে পারবেন।

পদ্মাৰ ইলিশেৰ স্বাদ কেমন লাগল- জানতে চাওয়া

মাত্রাই ৰূপদত্তৰ উন্নত, আসাধাৰণ! আসাধাৰণ!!

অপূৰ্ব!!! পদ্মাৰ ইলিশেৰ এত এত গল্প শুনেছি। আজ

খেলাম। অসাধাৰণ। এৱপৰ ক্ৰুজেৰ ডেকে দাঁড়িয়ে

সুৱেলো কঞ্চে গেয়ে উঠেন- ‘তোমাৰ খোলা হাওয়া,

লাগিয়ে পালে...’।

এই ক্ৰুজেই কথা হয় কলকাতার আৱেক প্ৰবীণ পর্টিক ইতি ঘোষৰে সাথে। তাৰ বাড়ি পশ্চিমবঙ্গেৰ

দক্ষিণ কলকাতাৰ নাকতলায়। বয়স ৮৫। বৃক্ষ

বয়সেও শুধুমাত্ৰ মনেৰ জোৱেৰ পূৰ্বপুৰুষদেৱ

বাংলাদেশ দেখতে এসেছেন।

ইতি ঘোষ বলেন, আমি বাংলা ভাষা বলতে পাৰি।

আমাৰ বাপ-দাদাৰা সবাই বাংলা বলতেন। এখনো

কাকাৰা বাংলা বলেন। বাংলাদেশ এসে আপনাদেৱ

সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লেগেছে সেটা হলো

আপনাদেৱ আতিথেয়তা। মনে হচ্ছে আমাৰ নিজেৰ

কোনো জায়গায় এসেছি। কাউকে কোনো কিছু

জিজ্ঞাসা কৰতে সংকোচ হচ্ছে না।

তিনি বলেন, আমি ১০ বছৰ আগে একবার

এসেছিলাম। নাড়িৰ ঢানে আবাৰ এসেছি। বাবা-দাদা

থেকে শুকু কৰে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰা সব বাংলাদেশে

ছিলোন। আমাৰ বাবাৰ জীবনেৰ শেষ ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশে আসাৰ। তিনি বাংলাদেশে আসাৰ জন্য কাঁদতেন। কিন্তু তখন পাৰিনি। যখন বাংলাদেশ হলো, তখন বাবাৰ শক্তি ছিল না।

এই প্ৰবীণ পর্টিক বলেন, রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৱেৰ কুঠিবাড়ি গিয়েছি, লালনেৰ আখড়ায় গিয়েছি। ভীষণ ভালো লেগেছে। আমাৰ নেচেছি, গেয়েছি।

নারায়ণগঞ্জেৰ পানাম সিটি, পুৱন ঢাকায় ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰ, আহসান মঞ্জিল, চটেক্ষৰী কালী মন্দিৰ,

প্ৰীতিলতা ওয়ান্দেদাৱেৰ বাড়ি, কুৱাজাৰ সমুদ্

সৈকত, রাঙামাটিৰ কাঙ্গাই লেক ঘৰে দেখেছি। এই বয়সে তো চলাফেৱা কৰাই কষ্টকৰ। বাংলাদেশ অমগেৰ সাহস কৱলেন কীভাৱে- জিজ্ঞাসা কৰতেই কেঁদে ফেলেন ইতি ঘোষ। বলেন, সব সময় বাবাৰ কথা মনে হয়। বাবাৰ দেশ, বাবাৰ দেশ। বাবাৰ শেষ ইচ্ছা ছিল এখনে আসাৰ, আসতে পাৰে নাই। তিনি আৱও বলেন, বাবাৰ কাছে বাংলাদেশে এত এত গল্প শুনেছি যে, সেগুলো এখনো চোখেৰ সামনে ভাসে। কোন গাছটা কোথায়, পুকুৰ পাড়ে কোন গাছ বাবা মুখস্ত বলে দিতে পাৰতেন। বাবা



ভীষণ করে চাইতেন এখানে আসার জন্য।

‘তবে আমরা যেমন টানে আসি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আসবে কিনা বলতে পারি না। তারা হয় তো বাংলাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসে। তবে টানে আসা আর ফাঁশনে আসা এক নয়। আমি চাই- পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পূর্বপুরুষদের বাংলাদেশ দেখার জন্য তাদের মধ্যে টান তৈরি হোক।

দৃদ্দেশের যাতায়াত ব্যবহাৰ আৱে সহজ কৰাৰ দাবি জানিয়ে ইতি ঘোষ বলেন, আমাৰ ভীষণ ইচ্ছা- দুদেশের যাতায়াতটা আৱে সহজ হয়ে যাব।

সীমান্তে অনেক বামলা, সেটা না করে সাধাৰণভাৱে অনুমতি দিলৈই হয়। যেমন কোনো অনুষ্ঠান হলে যেভাৰে আমৰা নেপাল বা ভুটানে চলে যাই।

শীতলক্ষ্যায় জাহাজে ভ্ৰমণ কেমন লেগছে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনাদেৱ আতিথেয়তা অনেক ভালো লেগছে। আপনাদেৱ খাৰাবদাবৰ অনেক ভালো। বাংলাদেশে আৱাৰ আসাৰ ইচ্ছা আছে কিনা- জিজ্ঞাসা কৰতেই এক গাল হেমে ইতি ঘোষ বলেন, বয়স পাৱমিট কৰাৰে কিনা জানি না!

বিজয় চক্ৰবৰ্তী, তাৱে বয়স ৬০ ছুই ছুই। সাৱেক এই ব্যাক কৰ্মকৰ্তা থাকেন কলকাতায়। তাৰ পূৰ্বপুৰুষৱাৰ তৎকলীন কিশোৱণগঞ্জ উপবিভাগেৰ মহামসিংহ জেলাৰ বাসিন্দা ছিলেন। দেশভাগেৰ আগে তাৰ বাবা চাকৰি পেয়ে কলকাতা চলে যান। প্ৰথম বাবেৰ মতো স্বীসহ বাংলাদেশে এসে আবেগপূৰ্বত হয়ে পড়েন তিনি।

পড়স্ত বিকালে নাৱায়ণগঞ্জেৰ রূপগঞ্জেৰ কৃষ্ণী জামদানি গ্ৰামে আলাপ হয় বিজয় চক্ৰবৰ্তীৰ সাথে। তিনি বলেন, আমৰা বাবাৰ কাছ থেকেই বাংলাদেশেৰ গল্প শুনেছি। দাদা বাংলাদেশেই ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাননি। তিনি এখনেই মাৰা গেছেন। আমাৰ বাবা ১৯৫২ সালে (পাকিস্তান আমল) ভিসা কৰে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এৱপৰ আমি প্ৰায় ৭০ বছৰ পৰ বাংলাদেশে আসলাম। এটা আমাৰ জন্য নষ্টালজিক বা ইমোশনাল ট্যুৰ।

পূৰ্বপুৰুষেৰ দেশে ভ্ৰমণেৰ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এই পৰ্যটক বলেন, বাংলাদেশেৰ অনেক জায়গায় গিয়েছি। বৰীদুন্নাথ ঠাকুৱেৰ কুঠিবাড়ি ও জীৱনান্দ দাশেৰ জন্মস্থানে গিয়ে আমাৰ সমস্ত শৰীৱেৰ যেন কাঁটা দিয়েছে। ডিনার কুঝে নদীৰ বুকে ঢেকে বাংলাদেশকে দেখছি- এটা অন্যৱকম অনুভূতি। সাৱা জীৱন মনে থাকবে। এছাড়া পানাম সিটি, ঢাকেষ্বৰী মন্দিৰ, আহসান মঞ্জিল, কক্ষবাজাৰ সমুদ্ৰ সৈকত, বাঙামাটিৰ কাষ্টাই লেক ঘুৱে অন্যৱকম অনুভূতি



হয়েছে। বাংলাদেশেৰ খাৰাবদাবৰ খুবই অসাধাৰণ লেগছে। তবে পদ্মাৰ ইলিশেৰ সামাদেৱ কথা কী বলেব! ফ্যান্টাস্টিক অ্যান্ড ক্লাসিক!

সুযোগ পেলে আৱাৰ বাংলাদেশে আসবেন বলেও জানালেন বিজয় চক্ৰবৰ্তী। এমনকি তাৰ ছেলেও সুযোগ পেলে আসবে। শেকড়েৰ টানে বাংলাদেশে আসা আৱেক নাৰী পৰ্যটক হলেন ইন্দ্ৰানী দাস। তাৰ বাসাৰ কলকাতায়। এই নাৰী বলেন, অনেক দিনেৰ ইচ্ছা ছিল, একবাৰ বাংলাদেশে যাব। কাৰণ আমাৰ বাবা ও দাদাৰ জন্ম বাংলাদেশে। তাদেৱ কাছে অনেক গল্প শুনেছি, কিন্তু বাংলাদেশ দেখাৰ সৌভাগ্য হয়নি। এজন্য বাংলাদেশকে দেখাৰ মনেৰ ইচ্ছা অনেক ধৰে ছিল। যখন বাংলাদেশে আসাৰ সুযোগ তখন আৱ সোভ সামলাতে পাৱলাম না, চলে এলাম। ইন্দ্ৰানী দাস বলেন, প্ৰথমে আমৰা কুঠিয়াতে গিয়েছিলাম। লালমেৰে মাজারটা খুব ভালো লেগেছে। ফৰিকদেৱ গান-বাজনা আমাকে অন্যৱকম অনুভূতি দিয়েছে। এছাড়া রবীদুন্নাথ ঠাকুৱেৰ কুঠিবাড়ি বইয়ে পড়েছি, কখনো দেখাৰ সুযোগ হয়নি। বাংলাদেশে এসে তাৰ স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি দেখে এতটাই ভালো লেগেছে যে বলে বোৱাতে পাৱব না। বৰিশালেৰ জীৱনান্দ দাশেৰ বাড়ি দেখেও খুব ভালো লেগেছে। কবি মুকুন্দ দাশেৰ বসতভিত্তিও খুব সুন্দৰ লেগেছে। তাদেৱ বসতভিত্তি দেখে অভিভূত হয়েছি। এখনো তাদেৱ স্মৃতিবিজড়িত জায়গা সংৰক্ষণ কৰে রাখা হয়েছে!

এই নাৰী পৰ্যটক আৱে বলেন, পশ্চিমবঙ্গেৰ সাথে বাংলাদেশেৰ সবই মিল রয়েছে। অমিল তো খুঁজে পাই না। কাৰণ আমি যখন বাংলাদেশে প্ৰথম পাৱাখি তখন আমাৰ কাছে মনে হয়নি, আমি আলাদা কোনো জায়গায় এসেছি। তবে বাংলাদেশেৰ মানুষেৰ ভালোবাসা আমাকে খুব মুঞ্চ কৰেছে। ঢাকা ডিনার কুঝেৰ ভ্ৰমণটা আসাধাৰণ ও উপভোগ কৰাৰ মতো ছিল বলে জানান তিনি। এখানে আয়োজকদেৱ আতিথেয়তা আমাদেৱ মুঞ্চ কৰেছে। কেনো কিছুৰ কৰ্মতি ছিল না। তাদেৱ ব্যবহাপনা খুবই ভালো। আসাৰ পৰ থেকেই তাদেৱ নানা ধৰনেৰ আয়োজন ছিল চোখে পড়াৰ মতো। আমৰা খুবই আনন্দিত। বাংলাদেশেৰ ইলিশেৰ ইসপসে ইন্দ্ৰানী দাস বলেন, সত্যি বলতে কি পদ্মাৰ ইলিশেৰ সাদ আলাদা। ডিনার কুঝে পদ্মাৰ ইলিশ খাওয়াৰ স্মৃতি মনে থাকবে সাৱা জীৱন। এজন্য খাওয়াৰ একদম শেষে ইলিশ খেয়েছি, যাতে স্বাদটা ধৰে রাখতে পাৱি। মোট কথা বাংলাদেশেৰ পদ্মাৰ ইলিশেৰ কোনো তলনাই হয় না।

ভাৱতীয় এই নাগৰিক বলেন, আমৰা আমাদেৱ বাৰাদাদার বাংলাদেশ দেখে গেলাম। আমাদেৱ পৰবৰ্তী প্ৰজন্মকেও একই বার্তা দেব- তাৱে যেন তাদেৱ পূৰ্বপুৰুষদেৱ বাংলাদেশ একবাৰ ঘূৱে দেখে। আমৰা আশাৰাদী, সুযোগ হলে তাৱাৰ বাংলাদেশ দেখতে আসবে। আৱাৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণেৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ইন্দ্ৰানী বলেন, বাংলাদেশেৰ মানুষেৰ এত অ্যাপায়ন এত ভালোবাসা ভুলি কী কৰে!

বাংলাদেশেৰ মানুষজন খুব ভালো। তাই আৱাৰ আসতে ইচ্ছে কৰছে। রিভার অ্যান্ড গ্ৰিন ট্যুৰসেৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, ‘চলো বাংলাদেশ’ ভ্ৰমণ উদ্যোগটি ভাৱতেৰ পশ্চিমবঙ্গেৰ বাঙালিৰ সাথে বাংলাদেশেৰ যোগসূত্ৰেৰ সেতুবন্ধে একটি অন্যন্য মাধ্যম। যাৱই ধাৰাবাহিকতায় দলবেশে ভাৱতীয় পৰ্যটক বাংলাদেশ ভ্ৰমণে আসছে। আশা কৰি, এই উদ্যোগটি যেমন পৰ্যটকদেৱ কাছে গভীৰ আগ্ৰহেৰ গত্তবে পৱিণত হয়েছে, তেমনি সকল গন্তব্যৰ যথাযথ সেবাৰ উন্নয়নেৰ মাধ্যমে ভৱিষ্যতে এটি পৰ্যটকদেৱ কাছে আৱে ও নান্দনিকভাৱে উপস্থাপন কৰা যাবে। সেক্ষেত্ৰে সৱকাৰ নানা উদ্যোগেৰ মাধ্যমে এই নষ্টালজিক, ইতিহাস ঐতিহ্যেৰ সংৰক্ষণ উদ্যোগেৰ মনোনিবেশ কৰবে। তিনি আৱে বলেন, এটি শুধু একটি ভ্ৰমণ উদ্যোগ নয়, ‘চলো বাংলাদেশ’ উদ্যোগটি পৰ্যটকদেৱ শেকড়েৰ টানে নষ্টালজিক আবেগেৰ আহ্বান। ◆





■ আমির খসরু সেলিম

শীত নামে উভরে | উভরবঙ্গে | নেমে আসে
পর্বতছোয়া হিমেল বাতাস | জড়িয়ে যায় কুয়াশার
বহস্যময় চাদরে | আসে পরিযায়ী পাথির দল | আসে
মিষ্ঠি সোনারোদ | বাংলাদেশের উভর অংশে,
যেখানটাকে রংপুর আর রাজশাহী বিভাগ বলে
চিহ্নিত করা হয়, যেখানে আঙ্গুল গুনলে ঘোলোটি
জেলা পাওয়া যায়; সেখানে শীত আসে অপরপ এক
ভঙ্গিমা নিয়ে | দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে উভরের
শীতকে একটু আলাদা করে চিত্রিত করা যায়। আজ
আমরা রংপুর বিভাগকে চিনবো, একটুখানি শীত
জড়িয়ে।

উভরের শীতের প্রধান বৈশিষ্ট হলো এর তীব্রতা।
দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় এদিকে একটু
বেশিই শীত পড়ে। তার কারণটি দাঁড়িয়ে আছে
আরও উভরে, পাশের দেশে। ইমালয় পর্বতমালায়।
পর্বতের শিখরছোয়া বরফের শীতলতা বয়ে চলা
বাতাসকে আরও শীতল করে তোলে। সেই বাতাস
ছড়িয়ে পড়ে উভরবঙ্গে। বাড়িয়ে দেয় শীতের
তীব্রতা। আবহাওয়া দণ্ডের রেকর্ডবুকে নিয়মিত
ওপরের দিকে থাকে উভরবঙ্গের কোনো না কোনো
জেলার নাম।

দেশের একেবারে উভরের জেলা পঞ্চগড়।
সীমান্তবর্তী এই জেলাটি নানা কারণে পর্যটকদের
টেনে আনে। কোনো এক শীতের সকালে, আপনি
সুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকালেন।
দেখবেন, আকাশের গায়ে ফুটে আছে ঝলমলে এক
পাহাড়ের ছড়া। হ্যাঁ, ওটাই কাঞ্চিনজঙ্ঘা। সমতল
থেকে পাহাড়ের উচ্চতার কারণে আর আবহাওয়া
অনুকূলে থাকলে, মনে হবে আকাশের গায়েই ফুটে
উঠেছে পাহাড়ের ছড়াট।

ওটা আরও কাছে থেকে দেখতে চান? চলে যান
আরও উভরে, তেঁতুলিয়া উপজেলায়। একেবারে

উভরের শীত

পঞ্চগড়ের শরীর যেঁষে দুটো জেলা।
নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁও। প্রথমে
নীলফামারীর দিকে তাকানো যাক।
শীতের কুয়াশা কত রকম, আর কী কী,
সব যেন এখানেই একসাথে ঘুরে
বেড়ায়। রাত নামার সাথে সাথে
এখানে নেমে আসে কুয়াশার চাদর।
সাদাটে আর দুর্ভেদ্য। যানবাহনের
শক্তিশালী আলোর খোঁচায় সেই
কুয়াশায় কুঙলী দেখা যায়। গাঢ়
ধোয়ার রাশি যেন সবকিছু ঢেকে দিতে
প্রাণপণ চেষ্টা করে যায়। প্রকৃতির সেই
আজব লীলা দেখতে চলে আসতে
পারেন নীলফামারীতে।
দেখতে পারেন তিষ্ঠা ব্যারেজ,
ধর্মপালের গড়, ডিমলা ফরেস্ট,
কুন্দপুরুর মাজার, হযরত শাহ
কলন্দরের মাজার, হরিশচন্দ্রের পাঠ।
আর জেলার নামের সাথে মিল রাখা
নীলসাগর তো দেখতেই পারেন। এটা
আসলে বিশাল এক দিঘি। এটির আগে
নাম ছিল রাজা বিরাটের দীঘি বা
বিন্যাদীঘি

সীমান্তে, এই জায়গাটি এক অন্তুত শান্তি এসে দিতে
পারে মনে, মননে। নদীর তীরে বসে, আরও কাছে
থেকে পাহাড় দেখার আনন্দ অন্যরকম। জলবায়ুর

স্থ্যতা থাকলে, এখান থেকে পাহাড়ের যে দৃশ্যটি
চোখে পড়ে, সেটা পর্যটকদের অনন্বরত টেনে আনে
এখানে। এখানকার স্নিখ প্রকৃতি মুঝ করে সবাইকে।
অনেকগুলো নদী আছে এখানে। নামগুলো ভীষণ
মিষ্ঠি। কয়েকটির নাম শুনুন- মহাবন্দ, ডাহক,
তীরনই, জোড়াপানি, বেরং, শাঁও। এছাড়া চায়ের
বাগান, কমলার চাষ, এসবও পঞ্চগড়কে আকর্ষণীয়
করে তলেছে। প্রততাঙ্গি আর ঐতিহাসিকভাবেই
জেলাটি নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে জেলাটির
নাম এমন, সেই পাঁচটি গড়ের নামও জানিয়ে দিচ্ছি-
তিতরগড়, মিরগড়, রাজনগড়, হোসেনগড় আর
দেবনগড়।

পঞ্চগড়ের শরীর যেঁষে দুটো জেলা। নীলফামারী ও
ঠাকুরগাঁও। প্রথমে নীলফামারীর দিকে তাকানো
যাক। শীতের কুয়াশা কত রকম, আর কী কী, সব
যেন এখানেই একসাথে ঘুরে বেড়ায়। রাত নামার
সাথে সাথে এখানে নেমে আসে কুয়াশার চাদর।
সাদাটে আর দুর্ভেদ্য। যানবাহনের শক্তিশালী আলোর
খোঁচায় সেই কুয়াশায় কুঙলী দেখা যায়। গাঢ়
ধোয়ার রাশি যেন সবকিছু ঢেকে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা
করে যায়। প্রকৃতির সেই আজব লীলা দেখতে চলে
আসতে পারেন নীলফামারীতে।

দেখতে পারেন তিষ্ঠা ব্যারেজ, ধর্মপালের গড়,
ডিমলা ফরেস্ট, কুন্দপুরুর মাজার, হযরত শাহ
কলন্দরের মাজার, হরিশচন্দ্রের পাঠ। আর জেলার
নামের সাথে মিল রাখা নীলসাগর তো দেখতেই
পারেন। এটা আসলে বিশাল এক দিঘি। এটির
আগে নাম ছিল রাজা বিরাটের দীঘি বা বিন্যাদীঘি।
নীলফামারী জেলার মাটি দারুণ উর্বর। ব্রিটিশ
আমলে নীলচামের জন্য এখানে ইংরেজেরা যাঁটি
গাড়ে। সেখান থেকেই জেলার নামকরণের
সূত্রপাত। উনিশ শতকের শুরুর দিকে স্থাপন করা
কিছু নীলকুঠির দেখাও এখানে পাবেন।

এবার ঠাকুরগাঁও জেলায় আসি । প্রকৃতি আর আধুনিকতা এখানে পাশাপাশি বাস করে ।
কোলাহলমুখৰ নগৰ যেমন পাবেন এখানে, তেমনি পাবেন শৱ্য প্রকৃতিৰ দেখা । বিলে-বিলে দেখা পাবেন শীতৰে পাখিৰে । টাঙ্গন, ছেট চেপা, কুলিক, পুনৰ্ভূ, তালমা, পাখৰাজ, নাগৰ, তিমাই, শুক, আমনদামান এমন সব নামেৰ নানান নদীৰ দেখাও এখানে পাবেন ।
যদি দশনীয়া স্থানেৰ তালিকা কৰতে বসেন, তাহলে সেটা লঞ্চ হৈতেই থাকবে বাবাৰেৰ মতো । কয়েকটাৰ নাম বলে যাই- ঢেলাৰ হাট মন্দিৰ, জামালপুৰ জামে মসজিদ । এগলো প্ৰতাধিক অধিদণ্ডৰেৰ তত্ত্বাবধানে সুৰক্ষিত । আৰও আছে হৱিপুৰ জমিদাৰ বাড়ি, আমাই দিঘি, রামৱাই দিঘি, ছেট বালিয়া মসজিদ, খুমনিয়া শালবন, শালবন্ডি ইমামবাড়া, মালদুয়াৰ দুর্গ ইত্যাদি । দক্ষিণ এশিয়াৰ সবচে বিস্তৃত দু'শ বছৰেৰ পুৱোনো আমগাছটিৰ দেখাও এই জেলাতেই পাবেন ।

উত্তরে সীমান্তস্থেঁয়া আরেকটি জেলা লালমনিরহাট। রেলযোগে এখানে আসা বেশ সহজ। শীতে হেবুর রসের স্বাদ নিত, হিমেল প্রকৃতির হোঁয়া পেতে আসতে পারেন এখানে। রেল স্টেশন থেকে নেমেই আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে ‘মুক্তিযোদ্ধা’ হোটেল। নানান স্বাদের খাবার তো পাবেনই, তবে এই হোটেলের মুখরোক নানাপদের ভর্তাৰ আয়োজন চমকিত কৰাৰে আপনাকে। শান্ত শহৱে বেড়াতে বেড়াতে দেখে নিতে পারেন প্রাচীন রেলওয়ে কলেনি, মুক্তিযুদ্ধৰ স্মৃতিকাঠৰ বধ্যভূমি। দেখে নিতে পারেন শেখ বাসেল শিঙ্গোপৰ্ক। কৌতুহল থাকলে বেড়ানোৰ মতো অসংখ্য জায়গা আছে এখানে। ভোগলিক কাৰণে ভাৰতৰে সাথে সীমান্ত-প্রান্তেৰ মানুষৰে চলাচলৰ জন্য তেৱিৰ কৰা ‘তিন বিঘা কৰিডোৱ’ এই জেলাতই খুঁজে পাবেন। ৬২০ খিলাব্দেৰ ‘হারানো’ মসজিদ, নিদারিয়া মসজিদৰে মতো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রত্নাস্ত্ৰিক স্থাপনাগুলোও দেখতে যেতে পারেন। দেখতে পারেন সিন্দুরমতি মন্দিৰ ও দিঘি, কাকিনা জমিদাৰ বাড়ি, ভূমি গবেষণা জাদুঘৰ। জেলাৰ নানান উপজেলায় ঘুৰে এখনকাৰ সৌন্দৰ্যৰ স্বাদ উপভোগ কৰাত পাৰেন।

এই জেলার পাশেই অবস্থিত কুড়িগ্রাম জেলা। ধরলা
নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা এই জেলার সদরটিও
ছিমছাম। ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলার কোল ঘেঁষেই
আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। প্রকৃতি ও
পরিবেশের পাশাপাশি শীতে আচম্ভ এই এলাকার
জীবনযাপনের বৈচিত্র্য মনোযোগ দিয়ে দেখে
নেবেন। আর যদি স্থীরত দর্শনীয় স্থানগুলোর কাছে
যেতে চান, দেখুন— ধরলা সেতু, শাঙ্গলা চতুর্ভু,
উত্তরবঙ্গ জান্দুরঞ্জ, চান্দামারী মসজিদ, কোটেশ্বর
শিবমন্দির, পাঞ্জা রাজার জমিদারবাড়ি, ঘড়িয়ালভাসা
জমিদার বাড়ি, ভিতরবন্দ জমিদারবাড়ি, জালাল
গীরের দরগাহসহ আরও নানান স্থান। খেজুর রসে
তেরি করা স্থানীয় গুড়ের স্বাদ নিতে ভুলবেন না
যেন। একটু সরে গিয়ে আমরা এবার দিনাঞ্জপুর
জেলায় যাই। এই জেলায় এক অপরপ প্রত্যতিক্রিক
নির্দশন আছে, যার টান দেশীয় পর্যটক তো অনুভব
করেনই, বিদেশি পর্যটকরাও দল বেধে সেই আশ্চর্য
সৃষ্টি দেখতে চলে আসেন। সেটা হলো কাস্তজির
মন্দির। মন্দির নিয়ে আশ্চর্য লোককথা সারামুখে
মুখে ফেরে। পাঠকদের জন্য সেটি তুলে ধরাই।
এটি জানা থাকলে মন্দির দর্শনে অন্তু শিহরণ
অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ଅନୁଭବ କରିବେ ପାଇଁନେ ।
ଗଲ୍ଲଟି ଏରକମ୍ - ‘ମହାରାଜ ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିଛେ । ତାର
ଚୋଥେର ପାତା କାପିଛେ । ସାବା ଶ୍ଵରୀର ଘାମେ ଭିଜେ

একাকার। ঘুমের মধ্যেই মহারাজ গোঙ্গানির মতো
শব্দ করলেন। শব্দ শুনে রুক্ষিণী দেবী চমকে জেগে
উঠলেন। প্রথমেই স্থামীর দিকে চোখ পড়ল তার।
মায়া হলো মহারাজের অবস্থা দেখে। দিনজঙ্গপুর নামে
বিবাট এক অঞ্চলের প্রতাপশালী মহারাজ। ঘুমের
ঘোরে শিশুর মতো কাঁদছেন। রানি আস্তে করে
স্থামীর গায়ে হাত দিলেন। স্পর্শের আশাসে স্বপ্নের
জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন রাজা। চোখে
মেলে তাকাতেই রানি বললেন, উঠো না। বিশ্রাম
নাও।
পরদিন সকালেই রানি ডেকে পাঠালেন রাজ্যের
প্রধান চিকিৎসককে। চিকিৎসক রাজাকে ভালো করে
দেখে বললেন- দুর্স্থার কারণে স্নায়বিক দুর্বলতা
এবং স্নেখান থেকে শারীরিক অচলতা দেখা দিয়েছে।
কালীবাড়ির প্রধান তাত্ত্বিককেও রানি খবর পাঠালেন।
তিনি এসে নানা রকম পূজা-পাঠের পর জানালেন,
মহারাজের ওপর দেবতাদের প্রভাব পড়েছে।
দেবতারা মহারাজের মাধ্যমে এমন কিছি করাতে চান

অমগপিপাসুদের জন্য রংপুরের বুকে
নানান আগ্রহের ঠিকানা পাওয়া যাবে।
কিছু জায়গার কথা উল্লেখ করলেই
সেটা স্পষ্ট হবে। যেমন- কারমাইকেল
কলেজ, তাজহাট জমিদার বাড়ি, প্রাচীন
শহর মাহিগঞ্জ, মৃত্তনা জমিদারবাড়ি,
ইটাকুমারী জমিদার বাড়ি, বেগম
রোকেয়ার বাড়ি, রংপুর ঢিয়িয়াখানা,
ভিরুজগং পার্ক। এগুলো খুবই জনপ্রিয়
স্থান। আরেকটু খোঁজখবর নিলে শুধু
রংপুর জেলা দেখতেই কেটে যাবে
অনেকগুলো দিন। বিশেষ ধরনের
মাদুর ‘শতরঞ্জি’ আর হাড়ভাঙ্গা আম
এখন রংপুরের ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে
দাঁড়িয়েছে।

তা কে চির স্মরণীয় করে রাখবে। শারীরিক দুর্বলতা যথা সময়ে কেটে যাবে। চিন্তার কিছু নেই। এদিকে মহারাজের ঘোরলাগা অবস্থা আরও বেড়ে গেল। বেশিরভাগ সময় ঘরে থাকেন। সহজে বের হন না। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা রাণিকেই কাঁধে তুলে নিতে হলো। বিচক্ষণ মন্ত্রীদের সাহায্যে টিকে রাইল রাজ্য। মহারাজ প্রাণনাথের দন্তকপুত্র রামানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রাণি ঝঞ্চী দেবী পুরো পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। এক সঙ্ক্ষয় মহারাজ প্রাণনাথ রাণিকে ডেকে পাঠলেন।
বললেন- দেবতারা আমাকে এক মহান কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। অনন্য এক মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন তারা। আজ রাতেই এই মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত করতে হবে। রাণি ভাবলেন, রোগের ঘোরে ভুল বকচেন রাজা। বিশেষ করে স্বপ্নের মন্দিরের যে বর্ণনা মহারাজ দিলেন, সেইকম মন্দির তৈরি করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। রাণির সাথে কথা বলে প্রাথমিক করতে বসলেন মহারাজ। মাঝারাতে স্বর্গ থেকে নেমে এলো দেবশিঙ্গীরা। দেখতে দেখতে ভোর হবার আগেই তৈরি হয়ে গেল সেই অপূর্ব যন্ত্রিক।

আমরা জানি, এ কাহিনি নিছকই এক লোককথা।
মহাবাজ প্রাণনাথ জীবদ্ধশায় মন্দিবের কাজ সম্ভব

করতে পারেননি। পরে তার পোষ্যপুত্র রামনাথ এটি
সম্পন্ন করেন। কিন্তু যে মূলত আর অলোকিক
ধারণা থেকে গল্পটি লোকমুখে ছড়িয়ে চলেছে, সেটা
একরকমের ভালোবাসাৰই প্ৰকাশ। পুরো
দিনাঙ্গপুরজুড়েই আছে নানা রকম দৰ্শনীয় স্থান।
হাতে সময় করে চলে আসুন। বিখ্যাত দিঘি
রামসাগর দেখাৰ জন্য পুরো একটা দিন হাতে
ৱাখতে পাবেন। মন জুড়িয়ে যাবে।
এবাৰ আমাৰা গাইবাবা জেলায় যেতে পাৰি। জেলাৰ
নামটি তাৰত লাগে, কিন্তু এখানেও প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য
প্ৰকাশে কোনো কমতি নেই। শীতেৰ সকালে কিংবা
বিকালে, গাছেৰ ডালে পাখিদেৱ কলকাকলি মুঢ়
কৰে সবাইকে।
বিস্তীর্ণ ভূমিতে হলুদ সৱিষা ক্ষেত্ৰে হাতছানি আপনি
এড়িয়ে যেতেই পারবেন না। চলে যেতে পারেন
জেলা সদৰ থেকে কাছেই, এসকেএস ইন রিসোৰ্টে।
সাজানো-গোছানো এই রিসোৰ্ট আপনাকে মুঞ্চ
কৰবে। প্ৰকৃতিৰ ছোঁয়া যেমন দেবে, তেমনি দেবে
আধুনিক সুযোগ-সুবিধা।

গাইবান্ধায় এলে খেন্দাকাৰৰ বিখ্যাত মিষ্টান্ন
‘রসমঞ্জীৰ’ স্থাদ নিতে ভুলবেন না যেন। দইয়ে
ডেবানো ছেট আকারেৰ মিষ্টি- এই বৰণনা শুনেও
সেটাৰ অপূৰ্ব স্থাদ ৰোখা যাবে না। চেথে দেখতেই
হৈব।

উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বলা যায় এর বিভাগীয় সদর
রংপুর জেলাকে। আর রংপুর সদরের প্রাণকেন্দ্র বলা
যায় টাউনহল চতুরকে। এখানে আছে কেন্দ্রীয় শহীদ
মিনার। আছে প্রাচীনতম ও আধুনিক দুটি পাঠাগার,
জেলা শিল্পকলা একাডেমি আর অসংখ্য সাংস্কৃতিক
সংগঠনের চাচাকচ। যেটাকে আমরা টাউনহল
বলছি, সেটা একটি প্রাচীন অডিটোরিয়াম। জেলার
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনসম্পত্তি অনুষ্ঠানগুলো এখানেই
পরিবেশিত হয়। এই টাউনহলকে যিরে আছে
মুক্তিযুদ্ধের বিষয় স্মৃতি। হানাদার বাহিনি একান্তরে
এখানে 'টার্চারসেল' খুলে বসেছিল। সংক্ষারের সময়
এখানে অনেক দেহাবশেষ পাওয়া যায়।

অমণ্ডলিপি সুন্দরের জন্য রংপুরের বুকে নানান আগ্রহের
ঠিকানা পাওয়া যাবে। কিছু জায়গার কথা উল্লেখ
করলেই সেটা স্পষ্ট হবে। যেমন- কারমাইকেল
কলেজ, তাজহাট জমিদার বাড়ি, প্রাচীন শহর
মাহিঙঞ্জ, মহনা জমিদারবাড়ি, ইটাকুমারী জমিদার
বাড়ি, মেগম রোকেয়ার বাড়ি, রংপুর চিত্তিয়াখানা,
ভিত্তিগঞ্জ পার্ক।

এগুলো খুবই জনপ্রিয় স্থান। আরেকটু খোঁজখবর
নিলে শুধু রংপুর জেলা দেখতেই কেটে যাবে
অনেকগুলো দিন। বিশেষ ধরনের মাঝে 'শতরঞ্জি'
আর হাতিভঙ্গা আম এখন রংপুরের প্রতিক্রিয়া
হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীতে উত্তরবঙ্গ একসময় বিষণ্ণতায়
আক্রান্ত হতো। সেই বিষণ্ণতার নাম 'মঙ্গা'। এর
মানে বোবায় 'শীতকালীন স্মৃতি'। সেই স্মৃতিটা
কখনো হয়েছে কাজের, কখনো খাদ্যের। টীব্র
শীতের প্রকোপে, হেমন্তের পর আর বোনো ফসলের
চায়াবাদ এখানে খুব একটা হতো না। কমহীন মানুষ
দুর্ভিক্ষের মতো নিখর সময় পার করতো। আধুনিক
কৃষি ব্যবস্থাপনার ফলে সেই সংকট দূর হয়ে গেছে
সেই কৰেই। মঙ্গা শব্দটি চলে গেছে বহুদূরে।
উত্তরের শীত এখন অভিশাপ নয়, আশৰ্বাদের
তালিকায় চলে এসেছে। শীতের আশ্রয়ে এখানে চাষ
হচ্ছে সুসাদু চা আর বাহারি কমলার। আসুন, এই
শীতে উত্তরে। এক মায়াময় ভূমিত।

লেখক: ছড়াকার ও পরিব্রাজক, ছবি- স্বাতীলেখা
লিপি। ♦



শীতের টাঙ্গুয়ার হাওড়

কল্প
গঞ্জ
ঢাকা

■ তারেক অধু

হাজার হাজারের দেশ ফিনল্যান্ডে বসে লিখছি, তাঁর
শীত পড়েছে বরাবরের মতো, পেঁজা পেঁজা তুলোর
মতো তুষার পড়ার দিন আপত্তত শেষ, এখন হাত
জমানো ঠান্ডার রাজত্ব। হিমাক্ষের ৩০ ডিগ্রি নিচে,
এত ঠান্ডায় তুষারপাতও বৰ্ক হয়ে যায়। পুরোনো
দিনের স্মৃতি রেমন্টন করছি আলগোছে, সাংবাদিক
বন্ধু সীমান্ত দীপু আবার তাগাদ দিয়ে রেখেছে
বাংলাদেশ কোনো উল্লেখযোগ্য জায়াগায় অমণের
ওপর লেখা দিতে হবে।

দেশ থেকে এসেছি অনেক বছর আগে,
কলেজীবনের পরপরই, এরপর কত দ্রুতগতিতে
বছরগুলো পার হয়ে গেল! ঘটল কত চিত্র-বিচিত্র
ঘটনা, বোহেমিয়ানদের মতো ঘুরে বেড়ালাম
ইউরোপের পথে প্রান্তরে, গেলাম সর্ব উভরের
মানববসতি স্পিটসবের্গেন দ্বীপপুঁজে, পৃথিবীর সর্ব
উত্তরে ছয় মাস দিন ছয় মাস রাতের রাজ্য উত্তর
মেরুতে, গিরিজাই হিমালয়ে, মধ্য প্রাচ্যের ধৃ ধৃ
বালিয়াড়ির মাঝে, আঙ্গসের সর্বোচ্চ শিখের ম রাতে,
আন্দেজের কোলে, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঁজে, তিব্বতের
নির্জনতায়, মেঝিকোর পিরামিডে, আফ্রিকার বুনো
প্রান্তে।

আহা, কী সব অপূর্ব স্মৃতি, সামান্য মনোযোগের
আভাস পেয়ে মনের মুকুরে রাখা প্রতিটি স্মৃতি
জ্বলজ্বল করে উঠছে, তারপরও কেউ যদি প্রশ্ন
করেন, ভূমণের মাধ্যমে কোন জায়গাটি সবচেয়ে
ভালো লেগেছে, কোনখানে বারংবার ফিরে যেতে
ইচ্ছে করে? বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই বলব-
সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়। যেখানে প্রথম যাওয়া
হয়েছিল বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের সাথে পরিযায়ী পাখি
পর্যবেক্ষণের জন্য ২০০২ সালে। সেই প্রথম বাড়ির
বাইরে সৈদ, পুরোনো রোজনামচার পাতা থেকে সেই
কথাই জানাচ্ছি আজ।

যাত্রা শুরু হলো ২২ ফেব্রুয়ারি, অজানার উদ্দেশে,



অদেখার উদ্দেশে। পাখিপ্রেমিক, আলোকচিত্রাহক
রোনান্ড হালদার ভাইয়ের অতি চমৎকার সব পরি-
যায়ী হাসের ছবি সমৃদ্ধ টি-শার্টের পেছনে দেখতাম
Have you ever been to Tanguar Haor?

মেন সেই হাওড়ে গোলেই এই রঙ বালমলে
পাখিগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। তখন থেকেই সুপ্ত
ইচ্ছা ছিল— দেশের একবারে সীমান্তেঁয়া পাখির এই
গুরুত্বপূর্ণ আবাসভূমিটি দেখে আসার। কাজেই
বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের সেখানে যাবার খবর পেয়ে
একরকম জোর করেই ইনাম ভাইয়ের কাছ থেকে
সাথে যাবার অনুমতি অদায় করলাম। সুনামগঞ্জকে
বলা হয়, বাংলাদেশের সবচেয়ে সমতল অঞ্চল, যে
কারণে এখানে মাইলের পর মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ
এলাকাজুড়ে রয়েছে পানি থৈ থৈ করা হাওড়।
এমনটা ও শুনলাম, এখন যে জমিগুলো আমার
দেখতে পাচ্ছি তার অধিকাংশই বর্ষাকালে পানির
নিচে তলিয়ে থাকে।

সুনামগঞ্জ শহরতলী থেকে সুরমা নদী পথে আমাদের
যাত্রা শুরু। সুরমা ভ্রমণের জন্য অতি চমৎকার নদী,
অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত, সর্বদাই শান্তভাবে বয়ে
চলেছে মুদুমন্ড হাওড়কে সাথি করে, প্রবল স্নোত
যেমন নেই এখানে, তেমন নেই বিকুন্দ চেট।

অনেক সময় মনে হয়, এ যেন মানুষের হাতে তৈরি
বড় ধরনের খাল, বিশাল এক সাপের মতো
একেকেঁকে তার অগ্রব্যের দিকে এগিয়ে গেছে।

দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলনাহীন। আসলে মাথার
ওপর অবারিত নীল আকাশ, পায়ের নিচে শান্ত
বহমান জলধারা, চারপাশের উন্মুক্ত প্রকৃতি যে

কোনো মানুষকেই কিছুটা ক঳নাবিলাসী করে তুলবে,
তবে বাধা এখানেও আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের
ইঞ্জিনচালিত বোটের বিরক্তিকর একধরে ঘটাট
উৎকৃষ্ট শব্দ, যাকে বলা চলে রীতিমত উৎপাত!
ও বলা হয়নি, এই ট্র্যালারই আগামী ৫ দিনের জন্য
আমাদের বাড়ি, শুধুমাত্র রাত্রিযাপন নয়- রান্না,
খাওয়া থেকে শুরু করে বাথরুম পর্যন্ত সবকিছুই
সম্পর্ক করতে হবে এখানেই। পাখি পর্যবেক্ষকের
সংখ্যা আটজন, বরাবরের মতো দলনেতা ইনাম ভাই
তার ক্যামেরা, টেলিস্কোপ আর দূরবীন নিয়ে ব্যস্ত,

মহাকাশ মিলন ভাই আর এমএ মুহিত ন্যস্ত যাত্রার তদারকিতে, পুরোনো ঢাকার আমান ভাই আর আইইউবিয়ের শিক্ষক সাবির ভাই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন তারিয়ে তারিয়ে। সাইফ আর আমি দলের কনিষ্ঠতম সদস্য, তাই বলে অপাংক্রেয় নয় মোটেই, আর আছেন সব যাত্রার একমাত্র বিদেশি সঙ্গী চেক ডাক্তার মারিশ্য ক্রাউনসোভা। নৌকার মারিবির সংখ্যা তিনজন, সর্দীর শওকত মারিবির পরিপাটি গোঁফ আর জৰা ফুলের মতো রঞ্জলাল চোখ বারবার এই অঞ্চলেরই কিংবদন্তি হাসন রাজার কথা মনে করিয়ে দেয়।

অভিযানের প্রথম দিনে যাত্রাবিরতি করতে হয়েছে মাত্র একবার এবং তা অবশ্যই পাথি দেখার জন্য। একদা সমগ্র বাংলায় যে পাখিটি সর্বদা চোখে পড়ত, আজ তা আশৰ্য রকমের দুর্ভু। আমি শুনের কথা বলছি। মানুষের অহেতুক ভীতি আর খাদ্য, বাসস্থানের ওপর আগ্রাসনের কারণে পরিবেশের দারুণ উপকারী এই পাখিটি অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, আর চোখের সামনে একসাথে চারটি শুকন, সে তো রাজদর্শনের মতই দুর্ভু। এই বিরল দৃশ্যটি কাছে থেকে অবলোকন করা আর তাদের ক্যামেরার ফেমে বন্দি করার জন্যই আমাদের প্রথম যাত্রাবিরতি। প্রথমদিন আরও এক বাঁক অতি দুর্লভ গ্রাণী দেখার হঠাৎ সুযোগ মিলেছিল আমাদের, তবে তা খেচর নয়, জলচর। নদীর এক বাঁকের মুখে শুকুক বা গাঙ্গেয় ডলফিনের ৭-৯ সদস্যের এক দলের সাথে সাক্ষাৎ ঘটল। ভয়ঙ্কর প্রাণী মনে করে অহেতুক শিকার করা আর নদী দ্বয়ের কারণে এদের সংখ্যাও ক্রমশ শূন্যের দিকে এগোচ্ছে, অথচ জীব বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় অক্ষ এই জীবগুলো কোনোভাবেই মানুষের ক্ষতি তো করেই না বরং নানা উপকারে আসে, এভাবেই দিন দিন মানুষের অঙ্গনতা আর কুসংস্কারের ফলে এদের বিলুপ্তি ঘটছে, যেভাবে বাংলাদেশ থেকে প্রায় চিরতরে হারিয়ে গেছে মেছো কুমির বা ঘড়িয়াল।

সন্ধ্যার অল্প পরেই আলো স্বল্পতার কারণে সেই রাতের মতো যাত্রাবিরতি করতে হলো যেকোনো লোকালয় থেকে অনেক দূরে কোনো এক অজ এলাকায়, অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির উপদ্বব এড়াতে নোকা থামানো হলো নদীর বুকে জেগে সদ্য জেগে ওঠা চরে। কাদায় ভর্তি সেই চরে হাঁটু পর্যন্ত না ডুবিয়ে হাটা প্রায় অস্ত্রব কাজ। তবে লোকালয় থেকে যত দূরেই থাকি না কেন, মশাদের গুণগুণ গান কিন্তু সেটা মনে করতে দেয়নি!

সকালে ঘুম ভাঙল সহ্যাত্মনের উভেজিত কথাবার্তায়, সবার কথার সারমর্মই এক- এই ভোরে আমের শিশ থেকে শুরু করে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই ঝান করতে নেমেছে, সূর্যদেব এখনো তার দর্শন দেননি, তবে খৰ শীত্যুই যে মেঘ আর কুয়াশার চাদর হচ্ছিয়ে তার অস্তিত্বের জানান দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর তখন সুর্যোদয়ের অপরূপ রঙ ভোরের মেঘে ছড়িয়ে গোটা প্রকৃতিকেই এক অপরূপ আভায় রাঙিয়ে তুলবে, আর অপরূপ সেই দৃশ্যকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করে ঝানাঝীদের ভালো কিছু ছবি তোলা সম্ভব হতে পারে, এটাই সবার আলোচা বিষয়।

যেমন কথা, তেমন কাজ। মোটামুটি সবাই ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরা হাতে নৌকার ছাদে চলে গেলেন, কিন্তু সবার মনেই একই প্রশ্ন কি কারণে আপামর জনসাধারণ এতো ভোরে ঠান্ডার মাঝে পানিতে নেমেছে! কে যেন বলে উঠল- আজ তো দুই! এরা তো দুদের গোসল করছে। আজ দুদের দিন, পরিবারের বাইরে প্রথম দুই করছি, আশৰ্য

কারো মনেই হয়নি, একবারের জন্যও না! অতএব, দুই মোবারক!

আবার যাত্রা শুরু টাঙ্গুয়ার উদ্দেশে, হাওড় এলাকায় অনেক আগে প্রবেশ করলেও মূল হাওড়ে তখনো প্রবেশ করিনি আমরা, কয়েক ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন যাত্রার পর চোখে মেন কিছুটা দৃষ্টিবিভ্রম দেখা দিল।

দৃষ্টিবিভ্রমই বটে, না হলে দেশের সবচেয়ে সমতল এলাকা, মাইলের পর মাইলে হাওড়ের জলা, এখানে পাহাড় আসবে কোথা থেকে। চোখ ভালো মতো

রংগড়ে আবার তাকালাম, আরে পাহাড়ই তো! তাও চা বাগানের ছোটখাটো তিলা নয়, একবারে সুউচ্চ

হয়েছে তাই, সুবিশাল জল-কাদাময় ভূখণ্ডের এক কোণায় কয়েকশ পায় শীল কালেম পাখির ঝাঁক। মানুষের রসনা তৃপ্ত করতে করতে এদের অস্তিত্ব ধূসপ্তায়, বাংলার এসব নিজেন বিরান প্রান্তরেই আজ তাদের আস্তানা।

টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যেখানে ফি-বছর পাখি পর্যবেক্ষকরা

নোকা থামিয়ে আস্তানা গাড়েন, সেখানে নোঙ্গের ফেলার সাথে সাথেই কুড়া সিগলের সাথে দেখা হলো, কাছেই গাছের মাথায় তার বিশাল বাসা, সেখানে ছানা লালন-পালন আর খাদ্য জোগড়েই সে ব্যস্ত। এই প্যালাসাম ফিশ সিগল বা পালাসি কুড়া



পাহাড়, অনেকটা টেকনাফ থেকে আরাকানের পাহাড় দেখতে যেমন লাগে সে রকম পাহাড়শেণি। হতবিহুল অবস্থা কাটালেন মিলন ভাই, অনেকটা ঘোষণা দেবার ভঙ্গিতে বললেন- মেঘালয়!

মেঘালয়!! তাই তো, আমরা এখন সীমান্তবর্তী এলাকায়, দূরে মেঘালয়ের পাহাড়শেণি আবস্থাভাবে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমে আছে, দূর থেকে মনে হচ্ছে পেঁজা তুলোর ভেলা ভিড় করে আছে, সহ্যাত্মনের কেউ বলে উঠল যথার্থ নাম মেঘালয়- মেঘের আলয়। পথে পানাবিলে দেখা হলো বিশ্বব্যাপী বিপন্ন এবং মাছ ধরায় অপরিসীম দক্ষতার অধিকারী পাখি অস্ত্রের (কালিগাল মেছো চিলে) সাথে, সে উড়ে এসেছে ইউরোপের কোনো প্রান্ত থেকে, নাতিশীতোষ্ণ শীতের আশায়। এরকমই এক বিশাল বিলের মাঝে ব্যক্তিগতীয় নীল ছোপ দেখে যেতেই সবার উৎসুক হয়ে নৌকা থামাল, যা ভাবা

দুগল বিশ্বের অন্যতম বিরল প্রজাতির শিকারি পাখি। প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থাগুলোর জোট- আইইউসিএন কতৃক প্রীত বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় পাখিদের তালিকায় রেডবুকে এদের নাম আছে। বাসোপযোগী গাছ এবং খাদ্যের উৎস জলাভূমি ধূসের কারণে এদের এক সময় বাংলাদেশের হাওড় প্রধান সমস্ত এলাকায় ও সুন্দরবনে দেখা গেলেও এখন প্রধানত সুনামগঞ্জেই দেখা যায়। এরা মৎস্যভেজী।

পালাসি কুড়া সিগলের উড়ার ভঙ্গি সত্যিকার অথেই রাজকীয়, বিশাল ডানার বিস্তার, কালো লেজের ঠিক মাঝখানের সাদা পালকের সারি লেজকে তিনরঙা পতাকায় পরিণত করেছে (তা উড়ত অবস্থায় চিহ্নিত করতেও সুবিধাজনক), আর পাখি সঞ্চালনের ভঙ্গি উড়াকে করেছে সুম্বামণ্ডিত দুগল বিশ্বের অন্যতম বিরল প্রজাতির শিকারি পাখি।

প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থাগুলোর জেট-আইউসিএন কর্তৃক প্রণীত বিশেষ বিলুপ্তিপ্রায় পাখিদের তালিকায় রেজিস্ট্রেশন এদের নাম আছে। বাসোপেয়োগী গাছ এবং খাদ্যের উৎস জলাভূমি ধ্বংসের কারণে এদের এক সময় বাংলাদেশের হাওড় প্রধান সমষ্টি এলাকায় ও সুন্দরবনে দেখা গেলেও এখন প্রধানত সুনামগঞ্জেই দেখা যায়। এরা মহস্যভোজী। পালাসি কড়া ইংগলের উড়ার ভঙ্গি সত্যিকার অর্থেই রাজকীয়, বিশাল ডানার বিস্তার, কালো লেজের ঠিক মাঝাখানের সাদা পালকের সারি লেজকে তিব্বতৰ্বা প্রতাক্কয় পরিণত করেছে (তা উড়ন্ত অবস্থায় চিহ্নিত করতেও সুবিধাজনক), আর পাখ সঞ্চালনের ভঙ্গি উড়াকে করেছে সুযোগমণ্ডিত। পাখ অন্তঃপ্রাণ ইনাম ভাই তখনি ভিড়িও ক্যামেরা হাতে সেই অপরূপ ইংগলকে ফ্রেমবন্দি করতে গেলেন, সারাদিনের অমর শেষেও আশ্র্য রকমের প্রাণবন্ত এই কাজপাগল মানুষটি! আমরা তখন আগামী ক'দিনের আবাসটি দেখে নেওয়ার সাথে সাথে মাঝির তৈরি চায়ের অপক্ষেবত।

বাবে নাকার তোর ঢায়ার অপেন্স হত।
পরদিন সাতসকালে উঠেই যাত্রা রাতেড়োজে, বড় ট্রলার বা বজ্রাজি নোঙরত, অপেক্ষাকৃত ছোট এক নোকা আনা হলো, যে তে আমরা টেলিস্কোপ, ভিডিও ক্যামেরাসহ সারাদিন হাওড়ে পাখি গবানীর কাজ করব। বিশাল বিস্তৃত তাঙ্গুয়ার হাওড়, যে দিকেই তাকাই থৈ থৈ পানি, অনেক জায়গা থেকেই কিনারা দেখা যায় না, তার মধ্যে একরঞ্জি নোকায় আমরা কজন থ্রাক্টিপ্রেমিক, খানিকপরই হাঁসের দলের সন্ধান পাওয়া গেল। দেশি মেটে হাঁস, চীলমাথা হাঁস, খুন্তে হাঁস, গিরিয়া হাঁসের দল খাবারের সন্ধানে চরতে দেরিয়েছে, আহ, কি অপরূপ সৌন্দর্য তাদের, তেল চকচকে ভেজা শরীরে সুর্যের আলো মেল ঠিকরে পড়ছে, কিছু মানুষ কেমন করে পারে এই পাখিগুলোকে গুলি করতে? এক জলার মতো জায়গায় প্রায় হাজার পাঁচকে উন্নুরে খুন্তে হাঁসের বিশাল ঝাঁক দেখা গেল, অবিকল খুন্তের মতো তাদের ঠোঁটের গড়ন, প্যাক প্যাক করতে করতে খাবারের সন্ধানে চেষ্টা করে আসে।

সুদৰ্শন পাখি নেট পিপির (যাদের অনেকেই লঞ্চ
লেজের কারণে জলময়ুর বলে) দল ভেসে যাচ্ছে নল
থাগড়ার বলে, হঠাৎ হাওড়ের এমন এক জায়গায়
হাজির হলাম আমরা, যেখানে শুধু হাঁস আর হাঁস,
জল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না থিকথিকে হাঁসের দঙ্গলের
ভিড়ে! অনেকক্ষণ গমনার পর জানা গেল প্রায় দেড়
লাখ হাঁস আছে সেই এক জায়গাতেই, তাদের ফাঁকে
ফাঁকে কিছু বড় খেঁপা ডুরুর ইতস্তত মাছ শিকারে
ব্যস্ত। আমরা বেশ দূরে অবস্থান করে টেলিস্কোপের
সাহায্যে ঘূর্ণিজ্বালা বলে পাখির দলে তা কেনে

পালাসি কুড়া ঈগলের উড়ার ভঙ্গি
সত্যিকার অর্থেই রাজকীয়, বিশাল
ডানার বিষ্ঠার, কালো লেজের ঠিক
মাঝখানের সাদা পালকের সারি
লেজকে তিনরঙা পতাকায় পরিণত
করেছে (তা উড়ত অবস্থায় চিহ্নিত
করতেও সুবিধাজনক), আর পাখা
সঞ্চালনের ভঙ্গি উড়াকে করেছে
সুষমামণ্ডিত। পাখি অস্ত্রোণ ইনাম
ভাই তখনি ভিডিও ক্যামেরা হাতে
সেই অপরূপা ঈগলকে ফ্রেমবান্দি
করতে গেলেন, সারাদিনের ভ্রমণ
শেষেও আশ্চর্য রকমের প্রাণবন্ত এই
কাজগাগল মানবটি!

ଆଲୋଡ଼ନେର ସୃଷ୍ଟି କରେନି, କିନ୍ତୁ ହଠାଏ ଏମନ ଏକ
ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ଅବତାରଣା ଘଟିଲ, ଯା ଚର୍ମକ୍ଷେତ୍ର
ଦେଖାର ମୌଭାଗ୍ୟ ଥୁବ ମାନୁଷେର ହେୟରେ ବଲେଇ ଆମାର
ବିଶ୍ୱାସ! ଏକବେଳେ କୋଣୋ ରକମ ଜାନନ ନା ଦିଯେଇ
ଦେଖି ମହାକାଶରେ ଉଙ୍କାର ମତ ସେଇ ବିଶାଳ ହାସେର
ଝାକେର ଓପର ଦୁଇ ଦିକ ଥିଲେ ଦୁଇ ପୃଥିବୀ ସବଚେଯେ
ଦ୍ରୁତଗତିର ପ୍ରାଣୀ (ଜଲଚର, ଶ୍ଵଳଚର, ଧେଚର ମିଳିଯେ)
ପେରିତ୍ରିନ ଶାହି (ପେରିତ୍ରିନ ଫ୍ୟାଳକନ) ତୋର ଗତିତେ
ଧେୟେ ଆସିଥେ, ଯା ସେଇ ଭାସମାନ ପାଥିଷ୍ଟୁଲୋର କାହେ
ମୁତ୍ତିମାନ ବିଭିନ୍ନିକା, ଯେକୋନୋଟାର ପ୍ରାଣ ତଥା ସୁତୋର
ଓପର ବୁଲିଛେ, ପ୍ରାଣଭୟେ ଦେଢ଼ ଲାଖ ହାସ ଏକସାଥେ
ସପାଟେ ଡାନା ଝାପଟିଯେ ଡାଢ଼ାଳ ଦୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଯେ
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ଅବତାରଣ କରିଲ ତାତେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଜନ୍ୟ ହେଲେ ଓ ଗୋଟା ଆକାଶ ଯେଣ ଢେକେ ଗେଲ ସେଇ
ଝାକେ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମହାକବି କଲିଦାସ ଦେଖିଲେ ହୟ ତୋ
ହସବଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଲିଖେ ଫେଲିଲେ, ଆର ଆମରା
ବେରସିକେର ଦଲ କେମନ ହ୍ରାନ୍ତାବାବେ ଦାଁତିଥେ ସେଇ
ମୌଳଦ୍ୟସୁଧା ଉପଭୋଗ କରିତେ ଥାକିଲାମ ।

ଦୁପୂରେ ଖାନିକିପର ଫେରାର ପଥେ ଜେଳେରେ ମାହିଦରାର
ବୀଶ ଫାଁଦେର ଓପର କୁଚକୁଚେ କାଳୋ ପାନକୋଡ଼ିର
ଝାକେର ଭେତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବିରଲ ପାଥି
ସାପପାଥି ବା ଉଦୟୀ ଗ୍ୟାଗରେର ଦେଖାଓ ମିଳିଲ, ଟାଙ୍ଗୁରାର
ଏହି ହାଓଡ଼ିଟି ଯେ ଜୀବୈଚିତ୍ରେ କତ ସମ୍ପଦଶାଳୀ!

ଇନାମ ଭାଇୟେର କାହେଇ ଜାନା ଗେଲ, ଏହି ବିଶାଳ
ହାଓଡ଼େର ଜୀବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କରେକ
ହାଜାର ଟନ ଇଉରିଯା ସାରେର ପ୍ରୟୋଜନ ହେତୋ, ଯା
ବାଂଲାଦେଶ କଥିନୋଇ ସ୍ତର ହତ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶାଳ
ହାସେର ଝାକେର ବିଶା ସେତ ପଯୋଜନୀୟ ପଞ୍ଚିବ ଜୋଗାଦ

দেয়! মাঝির রান্না টাটকা মাছের খোল দিয়ে উদ্বৃত্তি করে ছোট ছোট দলে সবাই বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে বের হলাম। মিলন ভাই সাইফকে নিয়ে রওনা দিলেন মেঘালয়ের পাহাড়ের উদ্দেশে, তার এক কথা- পাহাড় ছুঁয়ে তারপর ফেরত আসবেন। আমি আর মারিশ্যা আরেক প্রাণে রওনা দিলাম কাছের গ্রামগুলো দেখার আশায়, ইনাম ভাই বরাবরের মতো দুগলের ছবি তুলতে ব্যস্ত। টাঙ্গুয়ার চিত্তহরণকারী সূর্যাস্তের কথা আর নাই বা বলি, সে কেবলমাত্র চোখে দেখার জিনিস এবং অনুভবের জিনিস। সঞ্চ্যার বেশ খানিক পর ফিরে আসার সময় দেখি- আমান ভাই ছইয়ের পাশে আরাম করে চন্দ্রাহত মানুষের মতো বসে আছেন। শুধু বললেন- ‘ভাই, সূর্য ডোবার সময়টাতে দুগলটাকে দেখলাম দারণভাবে উড়ে এসে বাড়িতে বসল, আহ, বুকটা ভরে গেছে! এ জীবন সার্থকক!’ পরদিন যা ওয়া হলো হাওড়ের অন্যপ্রাণে, দেখা মিলল বিগুল মরচেরঙ ভূতি হাঁসের, যাদের সংখ্যা আমাদের জানামতে গোটা বিশ্ব লাখখানেকেরও কম। অথচ অবাক করা বিষয় হলো আমরা সেদিন দর্শন পেলাম নবাহ হাজারের মতো মরচেরঙ ভূতি হাঁসের! পরবর্তীতে ঢাকায় এসে ইনাম ভাই এই সংখ্যা জানাগোর পর গোটা বিশ্বে তাদের সংখ্যা একেবারে দিগ্নন ধরা হয়েছে, যা রীতিমত আশা জাগানিয়া। আরও দেখা মিলল উন্নুরে ল্যাঙ্গা হাঁস, ইউরোশীয় সিথী হাঁস, গাদওয়াল হাঁস, দেশ মেটে হাঁস লালবুঁটি ভূতি হাঁসের বিশাল খাঁকের। উল্লেখ্য, রামসার সাইট ঘোষিত এই হাওড়ে ২৬ প্রজাতির হাঁস এ পর্যন্ত দেখা গেছে, এমনকি সুদূর চীন থেকে আসা মান্দারিন হাঁস পর্যন্ত। শেষমেষ গ্রায় তিন লাখ হাঁস গুলাম আমরা। এই হাঁসগুলোর বিষ্ঠা সার হিসেবে এই বিশাল জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে মূল ভূমিকা পালন করছে।

ଆବାର ଫେରାର ପଥେ, ଦୂରେ ନଦୀ ବାକେ ମନେ ହଲୋ ଗାଛେ
ଗାଛେ ସାଦା ବିଶାଳ ଆକୃତିର ସବ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆହେ ।
ଏତ ବଡ କେନୋ ଫୁଲ ହତେ ପାରେ? ସାତ-ପାଁଚ ଡରେ
କାହେ ଯେତେଇ ଟାଙ୍ଗ୍ୟାର ଆରେକିଟ ଜାଦୁକରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୋ
ଗେଲ- ନଦୀର ସାରେ ଦେଶ କିଛୁ ଗାଢ ଆଲୋ କରେ ନାନା
ଧରନେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ, ଏଣ୍ଠିଲେ ତାଦେର ରାତ୍ରିକାଳୀନ
ଆବାସ, ଆହା ପୂରାମେ ସର୍ଗେର ବର୍ଣନା ବୁଝି ଏମନଟାଇ
ହୟ! ତାହି ଏତଦିନ ପରାଗ କାଶମନୋବାକେ ବଲି- ଜୀବନ
ଯତ ଜ୍ୟାଯଗାୟଇ ଯାଇ ନା କେନ, ଯତ କିଛୁଇ କରି ନା
କେନ, ଆମାର ସବଚେଯେ ଶ୍ଵରାଗୀୟ ଭରଣ ୨୦୦୨ ସାଲେ
ଶୀତେର ଟାଙ୍ଗ୍ୟାର ହାଓଡ଼େ ।

ଲେଖକ: ନିସଗ୍ନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ



শীতের পিঠা পায়েস

বাংলাদেশ মুক্তি বিজয় প্রতিষ্ঠান

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

বাঙালির লোকজ ইতিহাস-এতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। পিঠা-পায়েস সাধারণত শীতকালের রসনাজাতীয় খাবার হিসাবে অত্যন্ত পরিচিত এবং মুখরোচক খাদ্য হিসাবে বাঙালি সমাজে আদরণীয়। আত্মীয়স্বজন ও পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তুলতে পিঠা-পুলির উৎসব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পিঠা-পায়েস তৈরির ধূম শীতকালেই বেশি পড়ে। শীতকালে শুধু গ্রামবাংলায়ই নয়, শহরেও বাসা-বাড়িতে শীতের পিঠা তৈরি হয়। তবে নগর জীবনে পিঠা উৎসবের আয়োজন চোখে গড়ার মতো।

শীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় পিঠা হচ্ছে ভাপা পিঠা। এছাড়াও আছে চিতই পিঠা, দুধচিতই, ছিট পিঠা, দুধকুলি, ক্ষীরকুলি, তিলকুলি, পাটিসাপটা, ফুলবুড়ি, ধূপ পিঠা, নকশি পিঠা, মালাই পিঠা, মালপায়া, পাকন পিঠা, বাল পিঠা ইত্যাদি। বাংলাদেশে শতাধিক ধরনের পিঠার প্রচলন রয়েছে। কালের গভীরে কিছু হারিয়ে গেলেও এখনো পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

আসুন জেনে নিই- শীতের মজাদার কিছু পিঠা তৈরির নিয়ম-

খেজুরের রসের পায়েশ

শীতের বিভিন্ন পিঠার মধ্যে খেজুরের রসের পায়েশ অন্যতম। সকালের কাঁচা রস থেকে যে পায়েশ রান্না করা হয় তার স্বাদ অতুলনীয়। সঙ্গে নারিকেল কোরা দিয়ে এটিকে আরও সুস্বাদু করে তোলা হয়।

উপকরণ : পোলাওয়ের চাল ১ কাপ, খেজুর রস ১ লিটার, লবণ সামান্য, এলাচ ২টা, তেজপাতা ২টা, দারচিনি ২-৩ টুকরা, কোরানো নারিকেল ১ কাপ।

প্রস্তুত প্রণালী

পোলাওয়ের চাল পরিষ্কার করে ধূয়ে পানি ঝারিয়ে নিতে হবে। পাটায় সামান্য ভেঙ্গে নিতে হবে।

খেজুরের রস চুলায় দিয়ে একবাৰ বলক এলে তাতে চাল ও বাকি উপকরণ ঢেলে দিতে হবে। চাল সিদ্ধ হলে পায়েশ তৈরি হয়ে যাবে। নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন কৰুন।

নলেন গুড়ের তিলান্ন

উপকরণ : গুড় ১ কাপ, সাদা ভাজা তিল আধা কাপ, দুধ ১ লিটার, পোলাওয়ের চাল (আধা ভাঙ) আধা কাপ, বাদামকুচি ১ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা ২ টেবিল চামচ, মাওয়া গুঁড়া ২ টেবিল চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী

দুধে চাল দিয়ে ফুটতে দিতে হবে চাল সেক্ষ হয়ে এলে তাতে নারকেল, তিল, গুড় ও মাওয়া দিয়ে অন্বরত নাড়তে হবে। ঘন হয়ে এলে বাদামকুচি দিয়ে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন কৰুন।

খেজুরের গুড়ের দুধ চিতই

উপকরণ : আতপি চালের গুঁড়া ৩ কাপ, লবণ সামান্য, কুসুম গরম পানি প্রয়োজনমতো, গুড়ের শিরার জন্য ১ লিটার দুধ ও ১ কাপ খেজুরের গুড়।

প্রস্তুত প্রণালী

চালের গুঁড়া, লবণ ও পানি দিয়ে একটি গোলা তৈরি করে ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। গোলা মেন পাতলা



বা বেশি ঘন না হয়। মাটির ছাঁচের খোলা অথবা লোহার কড়াই চুলায় দিন। তাতে সামান্য তেল ও লবণ মাখিয়ে গরম করে মুছে নিন। বড় চামচের ১ চামচ করে গোলা প্রতিটি ছাঁচে ভরে দেকে দিন। তিন-চার মিনিট পর ঢাকনা খুলে পিঠা তুলে নিতে হবে। গুড় ও দুধ দিয়ে জুল দিয়ে শিরা তৈরি করে তাতে পিঠা এক রাত ভিজিয়ে রেখে পরিবেশন করুন দুধ চিতই।

খেজুরের গুড়ের দুধ-পুলি

উপকরণ : নারিকেল কোরানো ২ কাপ, গুড় এক কাপ, এলাচ ৩টি ও ঘি ২ টেবিল চামচ। পুলি তৈরির জন্য চালের গুঁড়া ২ কাপ এবং পানি ও লবণ পরিমাণমতো, দুধ ১ লিটার।

প্রস্তুত প্রণালি : ফাইপ্যানে ঘি, এলাচ ও নারিকেল দিয়ে ২ মিনিট ভেজে নিতে হবে। গুড় দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। নারিকেলের সঙ্গে গুড় মিশে গেলে একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে হবে। পুলি তৈরির জন্য একটি পাত্রে পানি ও লবণ দিয়ে বলক এলে চুলার আঁচ করিয়ে দিন।

আটা মাখা হয়ে গেলে ছেট গোল রূটি বানিয়ে ভেতরে নারিকেলের পুর দিয়ে পুলি তৈরি করুন। সব পিঠা জুল দিয়ে রাখা দুধে ভিজিয়ে ওপরে নারিকেল কোরানো ছড়িয়ে দিন। বেশ কয়েক ঘণ্টা রেখে পরিবেশন করুন।

পাক্কন পিঠা

উপকরণ : চালের গুঁড়া দুই কাপ, সিক্ক করতে পানি পরিমাণ মতো, চিনি ৪ কাপ, সিরার জন্য দুধ এক কেজি, এলাচ ২-৩টি, ফুড় কালার পছন্দমতো, ডিম একটি, বিস্কুট ২-৩ টুকরা এবং তেল ও লবণ পরিমাণ মতো।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে চুলায় পানি গরম দিয়ে পানি ফুটে উঠলে চালের গুঁড়া তৈরি করে নিতে হবে। কাই ঠাণ্ডা করে এর মধ্যে নিতে হবে। এর পর বিস্কুট ও ডিমের মিশ্রণ বানিয়ে নিতে হবে। পিঠা হয়ে গেলে দুধে ভিজিয়ে নিন। ◆



দুই চাকায় হিজল বনের খোঁজে

ত্যাগত্বান্তর

■ মো. আমানুর রহমান

জীবনে কখনো কি হিজল বন দেখেছেন? জীবনানন্দের সিঙ্গু সারস পড়েছেন, দেখেছেন নিশ্চয়ই মান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো; একবার স্পন্দে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো। কখনো কি আপনার মনে হয়েছে ঢাকার আশপাশে কোথাও কি হিজল বন আছে? মনে না হলেও কোনো সমস্যা নেই, প্রশ়্নাটা আমিই করলাম। রাহাত কোথা থেকে খবর পেয়েছে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হিজল গাছ আছে। কানের কাছে খালি ঘ্যানৰ ঘ্যানৰ কাহাতক সহজ করা যায়! পলাশ আর আমি কথা দিলাম ঠিক আছে নিয়ে যাব। সে মোতাবেক ১৭ জুন আমরা কালিয়াকৈরে যাব বলে ঠিক করি, কিন্তু রাতে পলাশ জানায় তার শঙ্গুরবাড়ির লোকজন আসবে তাই যেতে পারবে না। হতাশ না হয়ে আমি আর রাহাত বেরিয়ে পড়ি সকালবেলা মিরপুর ১০-এ; এক হয়ে আমরা রওনা দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পেটে নস্তা সেরে চন্দ্রায় আবার চা বিরতি দিয়ে ওখান থেকে কালিয়াকৈরের পথ ধরি। গুগল বাবাজির সহায়তা নিয়ে এগোতে থাকি আর শীত বর্ষার যে সমস্যা গুগলে থাকে তার শিকার হই, যে পথের মুখে আমাদের নিয়ে যায় সেখানে এই বর্ষায় সাইকেল বা গাড়ি তো দূরে থাক হেঁটেও এগোনে অসম্ভব, পেছনে ফিরে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তাই গুরুত্বপূর্ণ এক তিন মাথায় আমরা ফেরত আসি, জায়গাটির নামও চমৎকার, কুতুবদিয়া। তবে বলে বাখি- এই ভুলপথে কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, দুপাশের গাজীপুরীয় সৌন্দর্য দর্শনে আমাদের কোনো ঝাল্লি ছিল না। সবজ বনানী আর বর্ষায় সব নিচু জায়গাগুলো পানিতে ভরাট হতে শুরু করছে, বিলের আকার নিচ্ছে। গতিদানব পলাশ না থাকায় আমরা হেলেডুলে চালিয়েছি পুরোটা রাইড। আমাদের কোনো ধরনের তাড় ছিল না। যাইহোক, কুতুবদিয়া পৌছানোর কিলো ২ বা ৩ আগে শুরু হলো বৃষ্টি। আমরাও রেনকোট আর পঞ্চ পরে রাইডে মনযোগী হই। চা খেতে খেতে আলাপটা সেরে নিলাম কোনদিকে কী। মজার ব্যাপার ম্যাপ আমাদের নিয়ে গিয়েছিল মির্জাপুরের ভেতর, ওর তো দোষ নেই, তার অ্যালগরিদম তাকে সেভাবেই বলতে নির্দেশ করে। হিজলতলা বা তলী বলে কালিয়াকৈরে আর একটা জায়গা আছে কিন্তু পুরো বিপরীতে কিন্তু সেখানে হিজল বৃক্ষ অনুপস্থিত আর হিজল বৃক্ষ যেখানে আছে তার নামে হিজল নেই কিন্তু কাজে আছে। যাইহোক, তাদের জটিল পরামর্শে আমরা বৃষ্টিতেই পা চালালাম। এই বর্ষণা ছবিতে বা ভাষায় দেওয়া অসম্ভব। তবে ভর বৃষ্টিতে যাদের ঠান্ডার সমস্যা নেই, সবাইকে এমন



নির্জনতায় কোনো বিল বা বনের মাঝে চালানোর অভিজ্ঞতা নিতে বলবো।

আমরা সাইকেল চালাতে চালাতে মকস বিল পৌছাই আর বিলের পাশে এক রেঞ্জেরাঁয় চা খেতে খেতে দেখি দূরে এক বিছিন্ন দ্বীপ, ওদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানি ওতে যাবার পথও আছে আর এটার নাম ওরা দিয়েছে মনপুরা।

আগেই বলেছি- আমাদের তাড়া ছিল না, তাই কাদম্বাটি পেরিয়ে আমরা মনপুরা যাই আর নির্জনতার সর্বোচ্চ চূড়ায় হারিয়ে যাই। ভাবুন, চারদিকে পানি, প্রচুর বাতাস, ছোট ছাট ছেউ আছড়ে পড়ছে কিন্তু কোনো কলরব আড়া নিঃশব্দে ক্যাম্প করার জন্য আদর্শ এক জায়গা। ওদের সাথে আলাপ করে জানলাম- ৩০ জনের জন্য একরাত তাবু গড়তে ওরা অনুমতি দেবে ও হাজার টাকার বিনিময়ে।

আবার মূল সড়কে ফেরত আসি আর আমাদের মূল গন্তব্য হিজল বৃক্ষ দর্শনে এগোতে থাকি। পথে অধিকাংশ মানবই আপনাকে হিজল বৃক্ষের অনুসন্ধানে সঠিক তথ্য দিতে পারবে না, আর যেটা মনে হলো এটা মেনটের মতো এখনো ততটা জনগ্রিয় হয় নাই। রাহাতকে বললাম আমরা আর হিজল বৃক্ষের খোঁজ না নিয়ে বরং গলাচিপা ইউনিয়ন যাবার পথটা খুঁজে নিই, সেভাবেই আমাদের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছাই। এলাকার লোকজন বলেছিল- পাগলামি করতে আসছেন দুই তিনটা হিজল গাছ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমরা আবাক হলাম, মুঢ় হলাম, আসলেই হিজল বন আছে, টাঙ্গুয়ার মতো বিশাল পরিসরে নয় তবে ২৫/৩০টা গাছ হবে। এখনো কর্দম পথ কিন্তু আগস্টে নোকা নিয়ে জলমগ্ন হিজল বৃক্ষ দেখতে পারবেন। আমরা আবাক হলাম গাজীপুরের আরও দুই রাইডার ইতোমধ্যে সেখানে হ্যামক

টানিয়ে বিশামের জন্য প্রস্তুত। আপনি আবাক হবেন তাদের একজন এসেছেন একটি সাধারণ বাংলা সাইকেল নিয়ে। জি, সাধারণ বাংলা সাইকেল এবং তাই নিয়েই তিনি ঘুরে বেড়ান, ইচ্ছেটাই মুখ্য, ব্রান্ড আসলে গোণ। আপনি ট্রেক যোন্টের মালিক আর ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন, পিজ, কাউকে দান করে দিন, আপনার সাইকেলটা দুনিয়া দেখুক।

হ্যাপি সাইক্লিং, সাইকেল ছাড়াও দুনিয়া দেখা যায়, দেখুন মহান আল্লাহ দুনিয়া কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন!

আছা নিশ্চয়ই প্রতি শীতে আপনার একটা প্ল্যান থাকে, থাকে না? এই যেমন এবার বান্দরবান যাব বা রাঙ্গামাটি বা সেন্টমার্টিন কিংবা অন্যাভাবে চিন্তা করলে এই তো গতবার সমুদ্র দেখেছি তাহলে এবার না হয় পাহাড় দেখি- এরকম নানান প্ল্যান। এবার ঢাকার আশপাশে একটা প্ল্যান দিই দূরে যেতে হবে না। যদিও আমার ভ্রম ছিল বর্ষায়, আপনি এই শীতেও ঘুরে আসতে পারেন এই কল্পে কোনো ধরনের পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই, আর তাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতের পাখিসহ দেখতে পারবেন স্মিতিসৌধ, মকস বিল, গলাচিপার হিজল তলা, গাজীপুরের নিবিড় নির্জন বন।

যেভাবে যাবেন

রুট: মিরপুর-গাবতলী-স্মিতিসৌধ-চন্দ্রা-কালিয়াকৈরে-গলাচিপা-শালনা-গাজীপুর-বনমালা-দিয়াবাড়ি-মিরপুর।

লেখক: ভাইস প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ◆



সোনার চরে ক্যাম্পিং

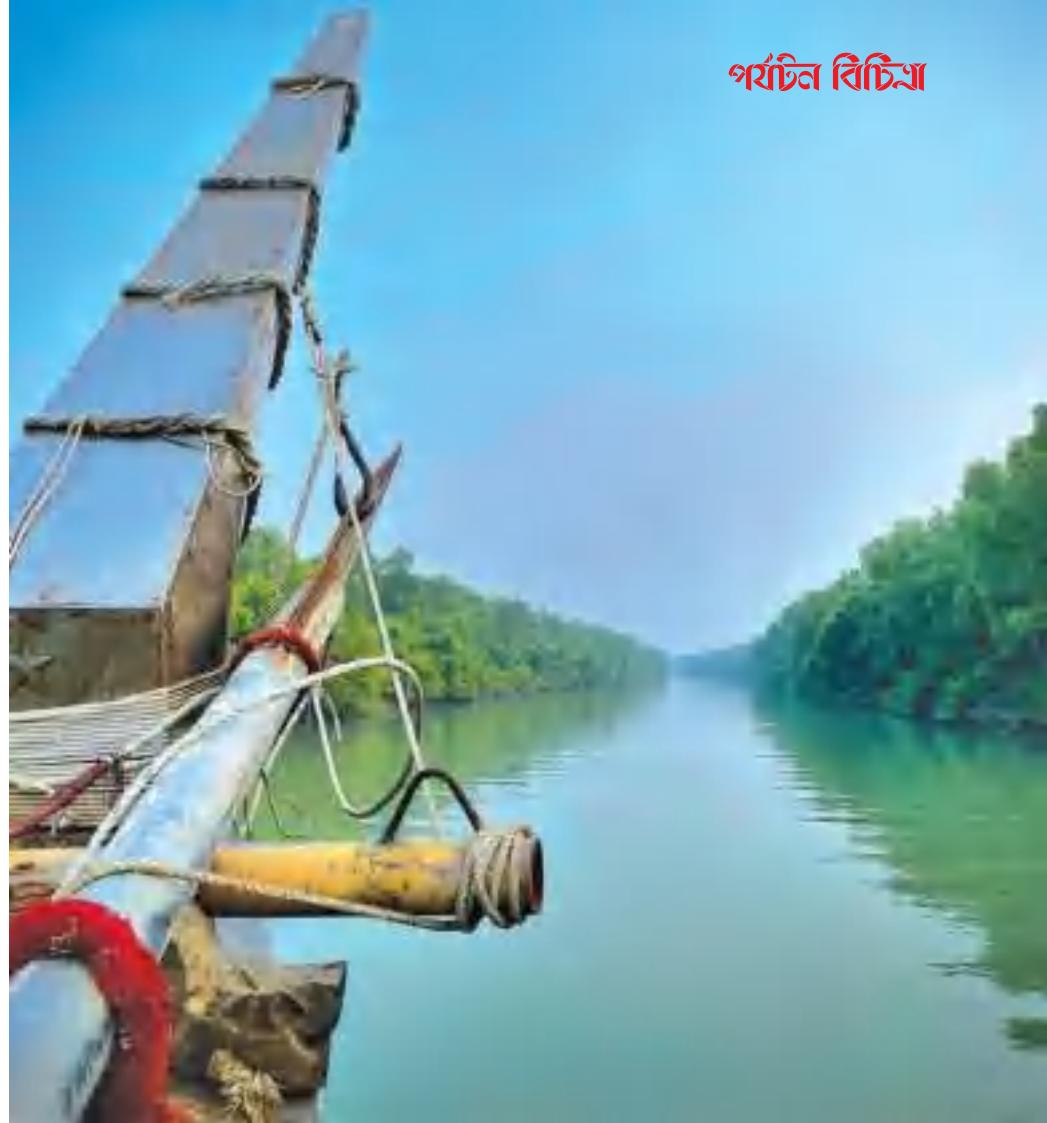
অ্যাডভেঞ্চুর

■ মনিরজ্জল ইসলাম

লঞ্চ যখন দুই দুইবার ডুবো চরে আটকালো, তখন
আর বুঝতে বাকি রইলো না সময়ের অভাবে পড়তে
যাচ্ছি। শীতকালে নদীর যৌবনের উচ্চলতা কমতির
দিকে থাকে, তার ওপর ঘন কুয়াশার চাদরে
দৃষ্টিসীমা করে আসে। এই মৌসুমে ডুবো চরে
আটকে যা ওয়া প্রায় রোজকার ঘটনা। আমাদের
এবাবের ছুটে চলার গন্তব্য- গলাচিপা হয়ে সোনার
চর। চরটি দুর্গম কিন্তু অগম্য নয়।

পটুয়াখালীর সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোলে
প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য নিয়ে জেগে আছে সোনার
চর। বুড়াগোরাঙ্গ নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে
দ্বীপটির অবস্থন। মোট আয়তন মাত্র ১০ বর্গ
কিলোমিটার। সুমুদ্র সৈকতটি পূর্ব-পশ্চিম হওয়াতে
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটাই দেখা যায়।
আমাদের লক্ষণের নামটি বেশ কাব্যিক ‘এমভি আসা-
যাওয়া’। আরও কাব্যিক হয়ে উঠলো যখন সে
রাজনকে রেখেই গলাচিপার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।
ঢাকা শহরের চিরচেনা যানজট চলতি পথের
মানবকে স্বর্বিত করে রাখলেও সময়কে ধরে রাখার
সাধ্য তার নেই। ফলাফল রাজন লঞ্চ ধরতে ব্যর্থ
হলো।

গলাচিপা পৌঁছে স্পিডবোট ধরে চর মোন্টাজ যেতে
হবে। স্পিডবোট পেতে হলে যেতে হবে সেই
বোয়ালিয়া অথবা পানপট্টি ঘাট। বোয়ালিয়া যাওয়ার
বাস্তা সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা ছিল না,
থাকলে যেতাম কিমা সন্দেহ আছে।



রাস্তা বলতে আসলে কিছু অবশিষ্ট নেই। অল্প কিছু ইট আছে, অধিকাংশই উঠে গিয়ে বড় বড় গতির সৃষ্টি হয়েছে, দু'একটা যা আছে তাও বুড়ো মানুষের দাতের মতো নড়বড়ে। কোনোভাবেই স্থির হয়ে বসা যাচ্ছে না। ইতোমধ্যে মাথায় আঘাত পেয়েছি।

ঝালমুড়ির মতো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যখন আমাদেরকে বোয়ালিয়া নামালো, তখন দেখি ঘাটে কোনো স্পিডবোট নেই। আগামীকাল এসব এলাকায় নির্বাচন, তাই গণপরিবহণ চলাচল বন্ধ। ভাগিয়স, আতিক সাহেব আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, না হলে এবারের মতো ওইখান থেকেই ফেরত আসতে হতো।

তেঁতুলিয়া নদীর কুলরেখাবিহীন জলরাশি কেটে ছুটে চললো আমাদের স্পিডবোট। বড় বড় টেউয়ের কবলে পড়ে একবার ওপরে উঠছে তো আরেকবার নিচে নামছে। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হলেও দুলতে যখন চর মেন্টাজ পৌছালাম তখন দুপুর হেলে পড়ছে। তোফাজল ভাইকে ফোন দিয়ে ঘাটে আসতে বললাম।

সুইজ গেট থেকে আমাদের জাহাজ চলতে শুরু করলো। হ্যাঁ জাহাজই তো- এত বড় ট্র্যালরকে জাহাজ বললে অন্যায় কিছু হবে না! নিজেকে কলঞ্চস কলঞ্চস মনে হচ্ছে, যেন নতুন কোনো ভূখণ্ড আবিষ্কার করতে দেরিয়েছি। তোফাজল ভাইয়ের সাথে দুজন সোক আছেন, আর আছে তার ভাইয়ের ছেলে ওসমান। বড়জোড় ১২-১৩ বছর বয়স হবে তার। মদ্রাসায় পড়ে, কিন্তু মদ্রাসা বন্ধ থাকায় সেও চলেছে আমাদের অভিযানে সামিল হতে। ঠান্ডার প্রকোপ সেরকম নেই। কিন্তু ফিনফিনে বাতাস কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ট্র্যালরের ডেকের অর্ধেকটা মাছ ধরা জালের দখলে। জালের ওপর গা এলিয়ে শুরু হলো আঞ্চা। সেই সাথে চলছে ছবি তোলা, ভানু ভাই তার বিখ্যাত সেলফি স্টিকের এন্টেমাল

ভালোভাবেই শুরু
করেছেন। খাল পেরিয়ে
তেঁতুলিয়া নদী হয়ে
বুড়াগোরাঙ্গ নদীর
মোহন।



পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা হেলে পড়েছে, যেকোনো সময় পৃথিবীর এ প্রান্ত অন্ধকার করে অন্য কেনে থান্ত অলোকিত করতে চলে যাবে। এমন সময় তোফাজল ভাই বললেন- ‘আমারা ক্যাম্প সাইটে চলে এসেছি, নামতে হবে’। ছোট একটা পাকা ঘাটের মতো আছে, সেখানে স্বিডি দেওয়াতে নামতে আর অসুবিধা হলো না। বাউ গাহের মাঝ দিয়ে সামনে এগোতেই খোলা চতুরে চলে এলাম। বাঁ-দিকটায় অবারিত জলরাশি, ডানদিকে বেশ ঘন জঙ্গল। আশপাশে বড় বড় গাছ উপত্তে পড়ে আছে। সুর্মের আলো চলে যাওয়ার আগে ক্যাম্পের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে তাঁবুগুলো খাটাতে হবে।

অন্ধকার নেমে আসার আগে মাহাবুব আশপাশটা বেরিক করে নিলো। যেহেতু সময়ের স্বল্পতা আছে, বেশি খোজাখুঁজি না করে, একটি জায়গায় ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। পর পর সাতটি তাঁবু পাতা হলো।

ক্যাম্প লাইটের আলোয় কবির আর সুজন চা বানানোর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। নতুন কেনা চুলা, কেটলি, গ্যাস- এগুলোর পরীক্ষা হবে আজ। আগুনের চারদিকে কুকুরকুগুলী হয়ে আঞ্চ চলছে। চায়ের ডাকে সবাই যার যার মগ নিয়ে হাজির। এরকম পরিবেশে এক কাপ চা যে কত আনন্দদায়ক সেটা বলে বোঝানো যাবে না। খাবারও তৈরি হয়ে এলো, যার যার প্লেট নিয়ে বসে পড়লাম। খাবার শেষে আশপাশে চেক করে ঘুমের রাজ্যে ডুবে গেলাম।

ঘুম ভাঙল তোফাজল ভাইয়ের ডাকে। দেরি করা যাবে না, যত তাড়াতাড়ি স্তৱের রওনা হতে হবে। ভাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। ট্র্যালরের তলা কাদায় আটকে যাওয়ার আগেই রওনা হতে হবে। আমরা শহুরে মানুষেরা মাঝে মধ্যে শহর ছেড়ে জঙ্গলে আসি হাঁফ ছেড়ে ঝাঁচতে। কিন্তু দু'একটি দিন আশা-তাঢ়ানাইনভাবে কাটিয়ে মন আরও অপূর্ণতায় ভরে যায়! আবার আসবো- মনকে এই বুবা দিয়ে ধেয়ে চলি আবার ইট-পাথরের শহরের দিকে।

লেখক: পরিব্রাজক ◆





সবুজ পাহাড়ের রাজ্য সাজেক ভ্যালি

কল্পনা পত্র

■ মহিউদ্দিন খান খোকন

পর্যটক হিসেবে আমার দেশ-বিদেশ ভ্রমণ শুরু হয়েছিল প্রায় চাল্লিশ বছর আগে ভারতের কলকাতা সফরের মধ্য দিয়ে। তারপর এশিয়ার সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন, হংকং, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ থেকে শুরু করে আমেরিকা, কানাডা, অন্ট্রিয়োগাসহ অনেক দেশেই যাওয়া হয়েছে। কিন্তু নিজ দেশের অনেক জেলায় যাওয়া হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই- জন্মভূমি না যুরে বিদেশে যুরে বেড়ানো মোটেই ঠিক হয়নি। সেই যে ‘পরের বাড়ির পিঠা গালো লাগে মিঠা’ বা ‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘৰ হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া’।

যাইহোক, পর্যটন ব্যবসার সাথে যখন নিজেকে যুক্ত করলাম, কক্ষবাজারে পাঁচ তারকা হোটেল ‘দি কক্ষ টুডে’সহ ঢাকায় গ্যালেসিয়া হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট এবং পরবর্তীতে বান্দরবানে ডি’মোর বান্দরবান হোটেলসহ আরও বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোতে থাকলাম। এক সময় বাংলাদেশের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পর্যটন এলাকাসমূহ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হলো, ব্যবসা এবং ভ্রমণ নেশা দুটোই আমাকে বাংলাদেশ ভ্রমণে আকৃষ্ট করতে থাকলো।

কক্ষবাজার, বান্দরবান, সিলেট, চট্টগ্রাম- এসব তো দেখাই ছিল, যেসব জেলায় যাওয়া হয়নি সেসব স্থানে ভ্রমণ শুরু করলাম। বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা কুয়াকাটা, শ্রীমঙ্গল, রাঙামাটি জেলায় ভ্রমণ করলাম। আজ আমি আপনাদের শোনাব- অসমৰ সুন্দর, বিস্ময়কর একটি স্থানের ভ্রমণ কথা। ইদানিং বাংলাদেশের পর্যটকদের মধ্যে এক ধরনের ক্রেজ শুরু হয়েছে এই সুন্দর জায়গাটি নিয়ে।

জায়গাটির নাম সাজেক ভ্যালি। রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় অবস্থিত এই সাজেক একটি বিখ্যাত এবং অতি পুরাতন (১৮৮০ সাল থেকে)

গাড়ি যে ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠছে তা বোৰা যায়। খোলা গাড়িতে বসে গোত্তা থেতে থেতে আমরা উঠে যাচ্ছি আকাশের দিকে, মেঘের দিকে। বহুদূরে নজরে আসে ভারতের মিজোরাম সীমান্তের বড় বড় পাহাড় আর মেঘের আনাগোনা। খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। কিন্তু নিজ দেশের অনেক জেলায় যাওয়া হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই- জন্মভূমি না যুরে বিদেশে যুরে বেড়ানো মোটেই ঠিক হয়নি। সেই যে ‘পরের বাড়ির পিঠা গালো লাগে মিঠা’ বা ‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘৰ হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া’।

পর্যটন স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এটি সমুদ্রপ্রস্থ থেকে ১৭২০ ফুট উচুতে অবস্থিত এবং এর কংলাক পাহাড়টি ১৮০০ ফুট উপরে অবস্থিত। ব্যবসায়িক ও পরিদর্শনকে উপলক্ষ্য করে ঢাকা থেকে সাজেকের উদ্দেশে রওনা হই মাইক্রোবাসে করে। সারাদিন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছাই তখন সন্ধ্যা নেমেছে। জানা গেল, সাজেক যাবার উপায় অতটা সহজ নয়।

খাগড়াছড়ি শহরে বাত যাপন করে পরদিন সকালে বিজিবির তত্ত্ববধানে বিশেষ গাড়িতে করে সাজেক যেতে হবে। আমরা খাগড়াছড়ি শহরে একটি হোটেলে বাত যাপনের বাবস্থা করলাম।

সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টা থেকে যাত্রা শুরু হয়, সকাল সাড়ে ১০টার পর আর গাড়ি যায় না। আমরা একটি চাঁদের গাড়ি (বিশেষ ধরনের ফোর হুইল গাড়ি) রিঞ্জার্ভ করে সকাল সাড়ে ৯টায় রওনা হলাম। সামনে পেছনে বিজিবির গাড়ি, মাঝখানে এক সারিতে প্রায় ৩০/৪০টি গাড়ির বহর আমাদেরকে স্কট করে পাহাড়ি রাস্তায় রওনা হলো। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, চারদিকে সবুজ গাছগাছালি, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে আদিবাসীদের জীবনযাপন। আদিবাসীদের কোনোরকমভাবে বেঁচে থাকার বাঁশের মাচানের ওপর তৈরি ছন্দের ধরবাড়ি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস, জুমচাষ, গাছ কেটে জালানি সংগ্রহ করে মাথায় বা রোধে ঝলসানো পিঠে বয়ে নিয়ে যাবার করুণ দৃশ্য। আর একটি ১০/১২ রুমের বাঁশের মাচানের ওপর ঘুমানোর জায়গ। মাঝে মাঝে খাবার হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পাহাড়ি মেয়েদের চা দোকান

গাড়ি যে ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠছে তা বোৰা যায়। খোলা গাড়িতে বসে গোত্তা থেতে থেতে আমরা উঠে যাচ্ছি আকাশের দিকে, মেঘের দিকে। বহুদূরে নজরে আসে ভারতের মিজোরাম সীমান্তের বড় বড় পাহাড় আর মেঘের আনাগোনা। খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। এগুলোকে হোটেল বলা বোধ হয় ঠিক হবে না,

অন্যরকম আবাসন ব্যবস্থা। এক একটি ১০/১২ কুমের বাঁশের মাচানের ওপর ঘুমানোর জায়গা। মাঝে মাঝে খাবার হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পাহাড়ি মেয়েদের চা দোকান।

দু'একটা একতলা দোতলা বিল্ডিং চোখে পড়েছে, তবে তা বিশেষ বাসিন্দাদের বসতবাড়ি। একেবারে রাস্তায় উঠেই একটি দোতলা বাড়ি। জান গেলো, এটি এলাকার সদর বা হেতম্যানের বাড়ি। পুরো সাজেকের এই রাস্তাটি সব। দুদিকে গভীর খাদ এবং দূরে পাহাড়। সবুজ ও মেঘের মাথামাথি। রাস্তাটি এই মাথা থেকে ওই মাথা খুব বেশি হলো এক দেড় মাইলের বেশি না। ওই দিকের শেষ মাথায় বিজিবির কিছু ভবন, রেস্টহাউস আছে, আর আছে একটি বিশাল হেলিপ্যাড। পাহাড়ের ওপর পরিচ্ছন্ন হেলিপ্যাডটি চামকান।

সাজেকের এই পাড়াটির নাম রাইলুই পাড়া। আমরা বিকালে এই রাইলুই পাড়া থেকেই ট্র্যাকিং করে কংলাক পাহাড়ে উঠলাম। পাহাড়ে ট্র্যাকিং করার জন্য হাতে একটি বাঁশের লাঠি ধরিয়ে দেয়া হয়, এটিকে অবলম্বন করেই আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে হয়। রোমাঞ্চকর তো বটেই। কংলাক হচ্ছে

সাজেকের সর্বোচ্চ পাহাড়, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট ওপরে। পাহাড়ে উঠার কষ্ট যেমন আছ, তেমনি মজাও আছে, তা না হলে মানুষ কষ্ট করে উঠে কেন? এ যেন ওপরে উঠার চেষ্টা, কিছু বিজয় করার চেষ্টা। কষ্ট হলো- শরীরের সব শক্তি যেন শেষ হয়ে গেল। যেমেন যেনে ক্লান্ত, ওপরে উঠে বিজয়ের আনন্দ সব ক্লান্তি দ্র করে দিলেও ছোট দোকান থেকে ঠাণ্ডা ড্রিংকস কিনে খেয়ে প্রাণ জুড়লাম। কংলাকে উঠে আদিবাসীদের কিছু পরিবার পাওয়া যায়, আদিবাসীদের জীবনযাপনের কিছু চিত্রও পাওয়া যায়। কংলাক পাহাড় থেকে ভারতের মিজোরাম সীমান্তের বড় বড় পাহাড়, গভীর সবুজেরণ্য, সাদা মেঘপঞ্জি এক অসাধারণ দৃশ্য।

সাজেকের এই কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সুর্যস্ত এবং সূর্যোদয় দেখা যায়। সমন্বের পাড়ে

দাঁড়িয়ে যেমন অতলান্ত নীল জলরাশি দেখে আনন্দ পাওয়া যায়, এখানে দাঁড়িয়ে তেমনি অসীম সবুজের অরণ্য অন্য রকম এক অনুভূতির জন্ম দেয়। নীল আকাশের সাথে সবজের মিশে যাওয়া, তার মাঝে সাদা মেঘের ওড়াউড়ি মনকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পুরো বাঙালামাটি জেলা, ভারতের মিজোরাম সীমান্ত সবই মোটামুটি দেখা যায়।

সন্ধ্যার আগেই আমরা পাহাড় থেকে নেমে এলাম, নামতে তেমন কষ্ট হয় না, তবে সাবধানে নামতে হয় যাতে পা হড়কে পড়ে না যায়। সন্ধ্যা নামছে, দুর্শ্যপট দ্রুত বদলে যাচ্ছে, চারদিকে অঙ্ককার এসে দৃষ্টিকে আটকে দিচ্ছে। আবছা অঙ্ককারে আর এক অপরপ দৃশ্যের জন্ম দিচ্ছে আমরা হেলিপ্যাডের খোলা জায়গায় একটু ঘোরাঘরি করলাম। ছবি তুললাম, ছবি তে সারা দিনই তুলেছি, সব দৃশ্য মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ধরে রাখার চেষ্টার অভাব ছিল না কারোরই।

আমরা ফিরে এলাম আমাদের কটেজের কাছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আদিবাসী সুন্দরী মেয়েটার হাতের চা খেলাম। আকর্ষণীয় বিষয় হলো- চায়ের কাপটি বাঁশের চোঙ দিয়ে বানানো। চায়ের এতো স্বাদ আগে পেয়েছি বলে মনে পড়লো না। আর্কিটেক্ট হাসান ভাই চা খেয়ে মুঝ হয়ে আদিবাসী মেয়েটিকে তার চায়ের দোকানের সহজ কিন্তু সুন্দর একটা ডিজাইন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই তাকে বানিয়ে দিল। আমরা রাতের আলো আঁধারিতে সাজেকের অপূর্ব সুন্দর



একমাত্র রাস্তাটিতে হাঁটলাম। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। এ যেন বাংলাদেশ নয় দার্জিলিংয়ের কোনো পাহাড়ি বাস্তায় হাঁটছি। রাস্তার পাশের কোনো কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসছে আদিবাসীদের বাদুয়স্ত বাজিয়ে গাওয়া তাদের নিজস্ব রীতির গান। তাদের বিনোদন, তাদের বেঁচে থাকার আনন্দ।

বেঢ়াতে যাওয়া তুরণ পর্যটকদের আনন্দ, উল্লাস, কোলাহল তো আছেই।

আমাদের রাতের খাবারের অর্ডার দিলাম মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটি বড় রেস্টুরেন্ট। আমাদের মেনু ছিল বাঁশের চোঙের ভেতরে রান্না করা মোরগ-পোলাও।

সাথে সালাদ এবং আরও কিছু ছিল কিন্তু বাঁশের চোঙে রান্না করা মোরগ পোলাও এতো স্বাদের হয়েছিল এবং এতো মজা করে খেয়েছি যে, অন্য

সব খাবারের কথা ভলেই গেছি! রাতে খাওয়ার পর একটু হাঁটাহাঁটি, চা-সিগারেট খেয়ে কটেজে ফিরলাম এবং ঘুমানোর আয়োজন।

পানির অপ্রতুলতা নিরসন, রাস্তার উন্নয়ন, সর্বোপরি নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি।

পরদিন সকালে উঠে নরম হাওয়ায় পরিচ্ছন্ন রাস্তাটি দিয়ে হাঁটছিলাম। রাস্তার পাশে পসরা সাজিয়ে বসেছে আদিবাসী মেয়েরা। পাহাড়ে ফলানো তাদের নানা রকম সবজি, পাহাড়ি কলা এবং জুমচারের বিন্ধি ধানের চাল; যাকে আমরা বলি স্টিকি রাইস আর পাহাড়ি কলা কিনে ফিরে এলাম কটেজে।

এরপর ফেরার আয়োজন। নাস্তা করে রেতি হতে হবে। কারণ, যথারীতি সকাল সাড়ে ছাঁটা থেকেই ফিরতি যাত্রা শুরু হবে। যাত্রা শুরু হলো আমাদের গাড়ি বহরের পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায়। এবারও আদিবাসী শিশুরা আমাদেরকে আগের মতোই হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল, যেন তারা বলছিল- ‘আবার এসো’।

সবুজ পাহাড়ি ঢাল, আদিবাসীদের বাড়ির উঠানে

পাহাড়ি মোরগের স্বাদীন বিচরণ, লোমশ সুদর্শন কুকুরের ঘেউ ঘেউ, পাথির ওড়াউড়ি সব পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। সাজেকের অপরপ সৌন্দর্যের স্মৃতি হান্দয়ে ধারণ করে আমরা ফিরে এলাম খাগড়াছাড়ি। সেখানে অপেক্ষমান আমাদের গাড়িতে রওনা হলাম চট্টগ্রামের উদ্দেশে।

লেখক: পরিব্রাজক ও পর্যটন পেশাজীবী ◆



ঘুরে আসুন বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর

প্রতিটি প্রকল্পের প্রতিটি অংশে

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

মুক্তিযুদ্ধসহ নানা ক্ষেত্রে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ভূমিকা জানাতে রাজধানী ঢাকার বিজয় সরণিতে তেরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর।

অত্যধিক এই জাদুঘর ভবনের চারপাশে বাঁশবাগান, সুপারিশাছের সারি, সবুজ মাঠ আর জলাধার- আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

১১ হাজার ৫০ বর্গফুটের জাদুঘরটিতে ছয়টি ভাগ-বিজয় অঙ্গন, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী গ্যালারি, তোশাখানা জাদুঘর, জাতিসংঘ ও পার্বত্য চৃত্গামে শান্তিরক্ষা কর্ণার। প্রতিটি গ্যালারিতে আছে একটি করে বঙ্গবন্ধু কর্ণার। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অর্জন ও গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী হতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর থেকে। শিশুদের জন্যও বেশ শিক্ষণীয় স্থান হতে পারে জাদুঘরটি।

জাদুঘরে ঢুকতেই প্রথমে আছে বিজয় অঙ্গন। এই গ্যালারির ভেতরে 'ইতিহাস দর্পণ: শশাঙ্ক থেকে শেখ মুজিব' এই অভিনব উদ্যোগ। এখানে উঠে

এসেছে বাংলার ভৌগোলিক ইতিহাস, কৈবর্ত বিদ্রোহ থেকে নানা জনযুক্তের স্মারক, পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহি বিদ্রোহ। শুধু যুক্তের ইতিহাস নয়, আছে পলাশীর যুদ্ধসহ ব্রিটিশ আমলে ব্যবহৃত কয়েকটি কামান।

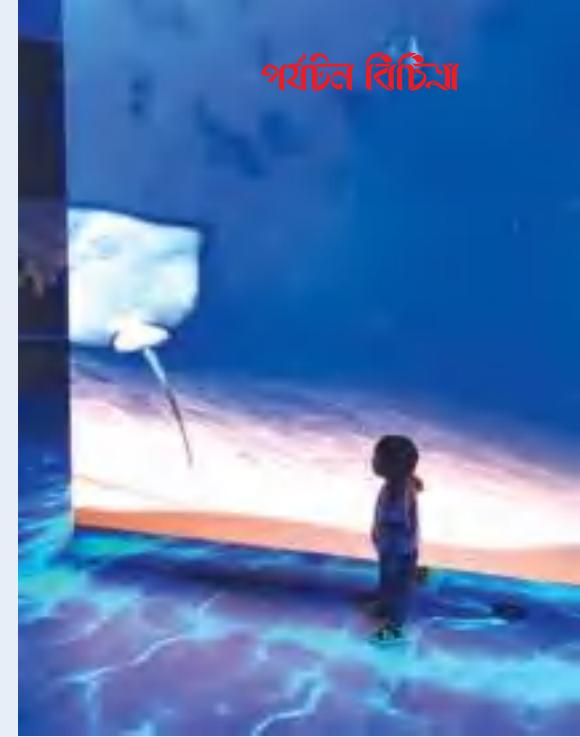
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দেখতে দেখতে দর্শকেরা এসে পড়বেন বিশাল গোলাকার কাচে ধেরা



এক প্রান্তে।

বিজয়ের মুক্তির আনন্দ যেন ধরা পড়ে ভবনের এই উন্নত কাঠামোর মধ্যে। কাচ ভেদ করে আসা প্রাকৃতিক আলোয় ভরা এ প্রান্তে চৌখুপি অঙ্কনে প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয়েছে নিরন্তর বাংলালির প্রতিবাদ থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধের লড়াই। প্রাচীন আমলের দুর্ঘের আদলেই গড়ে উঠেছে

এখনকার সেনানিবাস। বাংলার প্রাচীন সেই দুর্গগুলোর ইতিহাস আছে, আছে রেপ্লিকা। আছে অপারেশন সার্চলাইট থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের বড় বড় অপারেশনের প্রামাণ্য দলিল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সেনাবাহিনীর কর্ণারে গেলে অন্য রকম এক আবহ। মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র বাহিনীর বাংকারে থেকে লড়াইয়ের দৃশ্য



ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে। আছে মুজিব ব্যাটারি কামান থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ব্যবহৃত গাড়ি। একটি অংশে অজস্র অঙ্গৈর সভার। মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত অন্ত শুধু নয়, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে থেকে যুদ্ধ করে জয় করা অন্তও আছে।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের ভিত্তিতে হলো, এখানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ভাগ করে বিশাল এক ইন্টারঅ্যাক্টিভ মানচিত্র আছে। কোনো একটি সেক্টর স্পর্শ করলেই সেই এলাকা, সেক্টর প্রধানের নাম ও পরিচয়, গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনসহ আদোপান্ত উঠে আসবে। সঙ্গে থাকছে ভিডিও। আরেকটি ট্যাবে রয়েছে ২৪ হাজার সেনা মুক্তিযোদ্ধার তথ্য।

বিমানবাহিনীর গ্যালারিতে আছে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত নানা স্মারক। উড়োজাহাজের নানা যন্ত্রাংশগুলি করার মতো। নৌবাহিনীর গ্যালারিতে গেলে দর্শনার্থীরা যেন হারিয়ে যাবেন সমুদ্রতলের রাজ্যে। সেখানে রাখা সাবমেরিনে চুকে নৌযুদের আবহ বোৰা যায়। আছে সমুদ্রতলের পরিবেশের উপস্থাপনা। মুক্তিযুদ্ধেই শুধু নয়, দেশের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর রয়েছে অবদান।

একটি গ্যালারিতে সেসংক্রান্ত নানা তথ্যুপাত্ত ও সভার রয়েছে। এরই মধ্যে আছে পার্ব্য চুটগ্রামে শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা। আর্ট গ্যালারিসহ মাল্টিপারাম এক্সিবিশন গ্যালারি, ব্রিফিং রুম, স্যুভেনির শপ, ফাস্ট এইড কর্নার, মুক্তিমঞ্চ, থিডি সিনেমা হল, মাল্টিপ্রারামস হল, সেমিনার হল, লাইব্রেরি, আর্কাইভ, ভাস্কুল, মুরাল, কফি শপ, আলোকোজ্জ্বল ঘরণা, ভার্চুয়াল অ্যাকুয়ারিয়ামের খোঁজ মিলবে এখানে।

কীভাবে যাবেন

ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে বাস, সিএনজিচালিত অটোরিকশা কিংবা প্রাইভেটকার ভাড়া করে বিজয় সরণিতে নভো থিয়েটারের পাশে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর যেতে পারবেন। এছাড়া আপনার সুবিধা মতো পরিবহনে ফার্মগেট, বিজয় সরণি, সংসদ ভবন অথবা চন্দ্রিমা উদ্যানের সামনে পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন সামরিক জাদুঘরে।



কোথায় থাবেন

খাওয়ার জন্যে জাদুঘর কমপ্লেক্সে খুব সুন্দর একটি রেস্টুরেন্ট আছে। এছাড়া মিউজিয়ামের কাছে বিজয় সরণিতে বিভিন্ন খাবারের অনেক রেস্টুরেন্ট পাবেন।

আশেপাশের দর্শনীয় স্থান

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের সবগুলো গ্যালারি ভালো করে ধূরে দেখতেই আপনার প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। তারপরেও হাতে সময় থাকলে খুব কাছেই নভোথিয়েটার, চন্দ্রিমা উদ্যান, বিমান বাহিনী জাদুঘর, সংসদ ভবন এলাকা কিংবা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ধূরে দেখতে পারেন।

আরও যেসব তথ্য জানা থাকা জরুরি

সকাল ও বিকেল দুই দফায় জাদুঘর থোলে। বুধবার

বন্ধ। শুক্রবার বাদে অন্য দিনগুলোতে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত থোলা। আবার শুরু বিকাল ৩টা থেকে, চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। শুক্রবার শুধু বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত থোলা। তবে রমজান মাসে বুধ ও শুক্রবার জাদুঘর বন্ধ থাকবে। অন্য দিনগুলোতে থোলা থাকবে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত।

টিকিটের দাম: জনপ্রতি ১০০ টাকা। অনলাইনে টিকিট করে যাওয়া ভালো। এতে কম বাকিতে কাউটার থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। অনলাইনে টিকিট না কিনলে সেক্ষেত্রে সময় কিছুটা বেশি লাগতে পারে। অনলাইনে টিকিট কিনতে চাইলে <https://bangabandhumilitarymuseum.com/visitor/registration> এই ওয়েবসাইটে থাবেশ করুন ◆



ভ্রমণে আপনার প্রস্তুতি

শীতল
প্রক্রিয়া

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

এই শীতে কোথায় ঘুরতে যাবেন তা নিয়ে অনেকেই ভ্রমণ পরিকল্পনা করছেন। কোথায় বেড়াতে যাবেন তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভ্রমণ প্রস্তুতি। ভ্রমণের আগে ভালো প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করবে ভ্রমণ কর্তৃ আনন্দময় হবে। শীতে ভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে রইলো কিছু টিপস ও কৌশল।

ব্যাগ প্যাকিং

সঙ্গে কী নেবেন তা নির্ভর করবে আপনি কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন, কতদিন থাকবেন তার ওপর। যেমন পাহাড়ে বেড়াতে গেলে অবশ্যই ব্যাগের ওজন যত কম রাখা স্বত্ব তার দিকে মন দিতে হবে। তবে যেখানেই যান না কেন ব্যাগ ভর্তি জিনিস না নিয়ে দেখেশুনে দরকারি জিনিস নেয়াই উচ্চম। একটা ভারী ব্যাগপ্যাক আপনার ভ্রমণ আনন্দ মাটি করে দিতে পারে। তাই ব্যাগ গোছানোর সময় তেবে দেখুন আপনার একান্ত কি কি জামাকাপড় লাগতে পারে? সেগুলোর বাইরে সর্বাধিক একটি কিংবা দুটি জামা বেশি নিতে পারেন। টুথপেস্ট, ব্রাশ, আন্ডারওয়ার, গামছা বা তোয়ালে, ক্যাপ, জুতা, বেল্ট ইত্যাদি ছাড়াও অনুসারিক আর কি কি প্রয়োজন হতে পারে তার একটা লিস্ট করুন। লিস্ট ধরে ঠিক চিহ্ন দিয়ে একটা একটা জিনিস ব্যাগে ঢুকান, এতে করে দরকারি কোনো কিছু ভুলে ফেলে যাবেন না। তবে যাই লাগেজে ঢোকান না কেন একটা জিনিশ মনে রাখবেন, এই লাগেজ কিন্তু আপনাকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনীয় জামাকাপড়, জুতা, কসমেটিকস আলাদা করে প্যাক করুন, যাতে স্থান সঞ্চূলান হয় আবার জিনিসপত্র এলোমেলো হবে না।

ভ্রমণে পোশাক ও প্রসাধন

ভ্রমণের সময় পোশাক ও প্রসাধনের বাহ্যিক পরিহার করা উচিত। শীতকালে ভ্রমণে গরম কাপড় সঙ্গে নিন। লোশন, সানক্রিন, প্রারফিউম চেক-ইন লাগেজে রাখুন। সানগ্লাস-টুপি ভ্রমণ সহায়ক। সঙ্গে রাখুন কয়েকটি প্লাস্টিকের ব্যাগ। ভেজা কাপড় সংরক্ষণ করতে সহায়ক হবে। সুই-সুতা রাখুন। সমতল শহরে হেঁটে বেড়ানোর জন্য এক জোড়া স্পঞ্জ আপনাকে দারুণ আরাম দেবে। তবে পাহাড়ি এবং পাথুরে অঞ্চলের জন্য কেডস বেশি আরামদায়ক।



শীতকালে গাঢ় রঙের মোটা তাপনিরোধক কাপড়ের তেরি জামা পরিধান করুন। তবে খেয়াল রাখবেন শীতের কাপড়ের ওজন যত স্বত্ব যেন কম হয়। তা না হলে আপনার ব্যাকপ্যাক ভারী হবে শীতের পোশাকে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য সঙ্গে করে মাফলার, মোজা, ফ্লাভস, হৃদসহ কাপড় পরিধান করতে পারেন। জামার রং অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমরা ভ্রমণে বের হওয়ার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত। উজ্জ্বল রঙের কাপড়ে ছবি সুন্দর হয়। তবে পাহাড়ি বা বনাঞ্চলে ভ্রমণের সময় অবশ্যই উজ্জ্বল

কোনো রঙের জামা পরিধান করা উচিত নয়। প্রচুর হাঁটতে হবে এমন ট্যারে সাদা রঙের জামাই শ্রেয়।

ভ্রমণে দরকারি ওষুধ

শীতে সর্দি-জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি, নাকের প্রদাহ, চোখ ওঠা, ডায়ারিয়া, আমাশয়, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে। স্তব হলে প্রয়োজন মতো সঙ্গে ওষুধ রাখুন। জ্বর, পেট খারাপ, আসিডিটি, বর্মি, মাথা ধরার ওষুধ নিয়ে নিন। আরও নিন ব্যাস এইড, অ্যান্টিসেপ্টিক, পরিমাণ মতো তুলা ও গজ। এগুলো সঙ্গে থাকলে অনেক বড় বিপদ থেকেও রক্ষা পাওয়া স্বত্ব। সঙ্গে নেয়া এসব ওষুধপত্রের একটি তালিকা আগেভাগেই তৈরি করে রাখতে পারেন।

প্রেশার, ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে নিন। এই শীতে ভ্রমণের সময় ত্বক ও হাত-পা, চুলের বিশেষ যথুন নেয়া প্রয়োজন।

সানপ্রোটেন্টে লোশন ও ক্রিম সূর্যের আলোতে বের

হওয়ার আধা ষষ্ঠা আগে ব্যবহার করুন। ভ্রমণে যদি

প্রচণ্ড গরম অনুভব হয় তবে প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার

বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। বাস্তাদের দিকে

বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

দরকারি ডিভাইস

ভ্রমণে মোবাইল, ল্যাপটপ, ক্যামেরা সঙ্গে থাকে। সেগুলো রিচার্জ করার জন্য সঠিক অ্যাডাপ্টর সঙ্গে নিয়েছেন তো? দেশভেদে ইলেক্ট্রিক প্লাগ, সকেট, ভোটেজ ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভ্রমণ একটি দীর্ঘ চলমান প্রক্রিয়া। আমগিকেরা বারবার দেশস্তরি হবেন। তাই বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের অ্যাডাপ্টর সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন আর আজীবন তা সংগ্রহে রাখুন। ◆

জ্যোতিবসুর পৈতৃক বাড়িকে 'বারদী পর্যটন কেন্দ্র' ঘোষণা

প্রকাশনা কর্তৃত

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার বারদী চৌধুরীপাড়া গ্রামে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথেক মুখ্যমন্ত্রী প্রযাত জ্যোতিবসুর পৈতৃক বাড়িকে বারদী পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করেছে সরকার। গত ২৯ জানুয়ারি (রোবরার) বিকালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন 'বারদী পর্যটন কেন্দ্র' আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়।

কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো। মোকাম্মেল হোসেন। এ সময় অন্ধদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আশরাফ আলী ফারুক, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আলি কদর (গ্রেড-১), পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক জামিল আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক জাকির হোসেন সিকদার, সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো। রেজওয়ান উল-ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো। ইব্রাহীম, বারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লায়ন মাহবুবুর রহমান বাবুল, জ্যোতি বসুর বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ইউসুফ আলীসহ স্থানীয় প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বাধীন।

জানা গেছে, ২০১০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের সিন্ধিরগঞ্জে ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পশ্চিমবঙ্গের সাথেক মুখ্যমন্ত্রী প্রযাত জ্যোতিবসুর সোনারগাঁয়ের বারদীর বাড়িকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। সেই লক্ষ্যে ২০২০



সালের জানুয়ারিতে পর্যটন কেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০২২ সালে এই কাজ শেষ হয়। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। নির্মাণ করা হয়েছে সুপরিকল্পিত ভবন। আছে রাত্যাপনের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, রেষ্টোরাঁ, স্যুভেনির শপ, নারী-পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র ওয়াশ কুম, পিকনিক শেড ও কার পার্কিং প্লেস।

সচিব মো। মোকাম্মেল হোসেন বলেন, এখানে পর্যটকরা জ্যোতি বসু সম্পর্কে ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। পর্যটকদের সুবিধার জন্য দোতলা দুটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে জ্যোতি বসুর অনেক বই রয়েছে। বসে পড়ার সুযোগও আছে। নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে থাকা-থাওয়ার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ◆





টেকসই পর্যটন উন্নয়ন: সুন্দরবন প্রেক্ষিত

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

অমগ্কারীদের কাছে সুন্দরবন খুবই আকর্ষণীয়। সুন্দরবনের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা দেশের অন্য কোথাও নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ এই নির্দর্শনকে ঘিরে দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের যথেষ্ট সহাবনা রয়েছে। সুন্দরবন পৃথিবীর আদিম অনাবিস্থিত বনভূমিগুলোর মধ্যে অন্যতম। দুর্দমনীয় আকর্ষণ সুন্দরবনের আসল বৈশিষ্ট্য ভয়কর সৌন্দর্য। পৃথিবীর আর কোনো ম্যানগ্রোভ বনে বাধ নেই, সুন্দরবনে আছে। প্রতিবছর লাখে পর্যটক বিশেষ সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন দেখতে যান। বিশেষ করে শীত মৌসুমে এই সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই অন্যর বিষ এতিহ্য সুন্দরবনের টেকসই পর্যটন ব্যবস্থাপনা এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের যথেষ্ট সহাবনা থাকলেও নানা প্রতিবন্ধকর্তায় অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেশি বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও কেবল প্রচার প্রচারণা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এই খাতের সঠিক বিকাশ হচ্ছে না।

সুন্দরবনে বিভিন্ন টুর অপারেটর সুত্রে জানা গেছে, সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পটে নির্দিষ্ট স্টপিজ নেই,

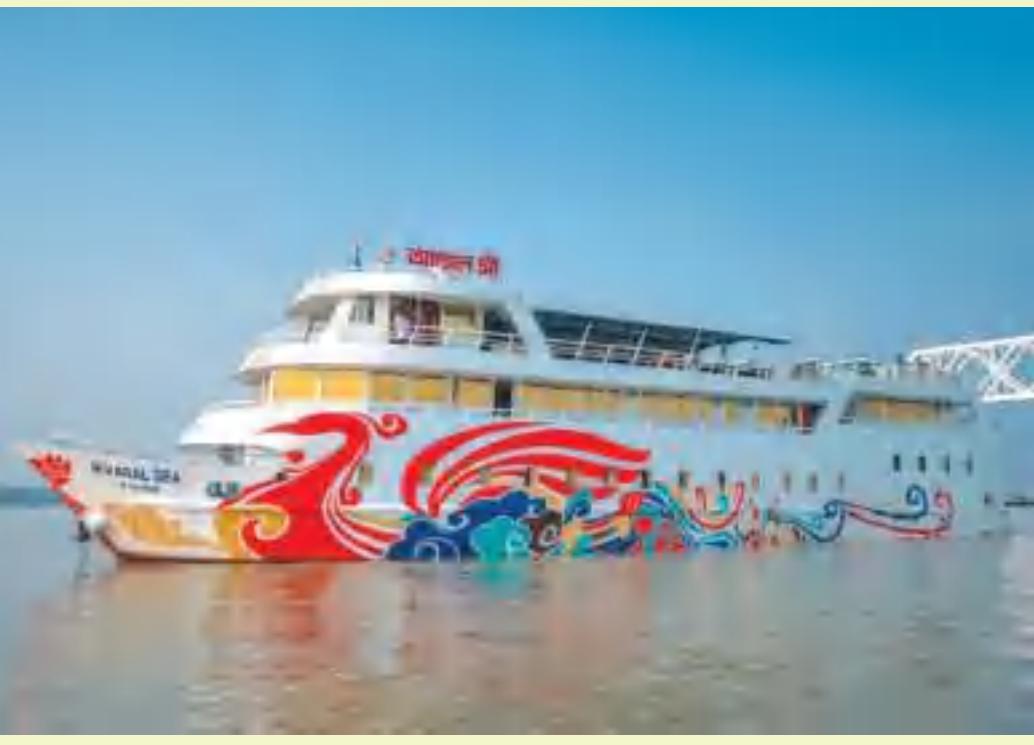
চলাচলের জন্য কোনো পথ নির্দেশিক নেই। এছাড়া পর্যটকরা পর্যাপ্ত গার্ডও পান না। পর্যটকের সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি সুযোগ-সুবিধা বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এছাড়া দেশি পর্যটকের তুলনায় বিদেশিদের সুন্দরবন ভ্রমণের ফি অনেক বেশি। এতে তারা ভ্রমণে আগ্রহ হারাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ এবং কার্যকর উদ্যোগ নিলে পর্যটন খাত হিসাবে সুন্দরবন দেশের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ভালো



যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রিসোর্ট বা হোটেল-মোটেল নির্মাণ হলে পর্যটক আরও বাড়বে। সেই সাথে যে তিন মাস (বর্ষাকাল) সুন্দরবন ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা সরকার উত্তিয়ে নিলে ওই সময়েও নিয়মিত টুর পরিচালনা করা যাবে। পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারলে সুন্দরবন পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে করছেন পর্যটক বিশেষজ্ঞরা।

বনবিভাগ সুত্রে জানা গেছে, সুন্দরবন এখন দেশের রাজপ্রকাশতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সুন্দরবনে পর্যটকদের জন্য এখন সাতটি ইকোপার্ক রয়েছে। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুন্দরবনে দর্শনার্থীদের থেকে আয় বেড়েছে। সুন্দরবনকে ঘিরে ইকো-টুরিজমের ব্যবস্থা করা হলে তা থেকে আয়কর অর্থ দেশের অর্থনৈতির চাকাকে আরও গতিশীল করবে। সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য প্রতিটি জাহাজে ৭৫ জনের বেশি পর্যটক না নেওয়ার



বিধিনিষেধ আছে বন বিভাগের। তবে সেই নিয়ম মানছেন না অনেকে সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটনশিল্প সুন্দরবন পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে। পর্যটনের মাধ্যমে অনেকের নতুন আয়ের সংস্থানও হয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে যে হারে জাহাজ বনে যাতায়াত করছে, তাতে বন আর বনের আবহাওয়ায় থাকে না। বিশেষ করে সার্ভিস লক্ষণগুলো ধারণক্ষমতার কয়েক গুণ মানুষ বোটে তুলে যাত্রীদের জীবন যেমন

বিপদাপন্ন করে তোলে, বনের পরিবেশও তেমনি নষ্ট করে দেয়।

সুন্দরবনে ট্যুর পরিচালনাকারী মালিকরা জানিয়েছেন, সুন্দরবন ভ্রমণে বন বিভাগের যেসব সক্ষমতা থাকা দরকার তা নেই। জনবলের সংকট রয়েছে। পর্যটক ও ট্যুর অপারেটরদের আসা-যাওয়ার তথ্যসংবলিত কোনো সফটওয়্যার নেই।

তবে সুন্দরবন ভ্রমণে ট্যুর অপারেটর, পর্যটক ও বন

বিভাগের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আপাতত ওই নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।

এছাড়া পর্যটকদের জন্য বাড়েনি সুযোগ-সুবিধা। পর্যটকদের জন্য প্রাথমিক ও জরুরি চিকিৎসা, রাতে অবস্থান, বিশুদ্ধ পানি ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও নিশ্চিত হয়নি। বনের মধ্যে থাকা ওয়াচ টাওয়ার, জেটিগুলো ও নাজুক অবস্থায় বয়েছে। বনের অধিকাংশ এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। ফলে সন্দরবনে প্রবেশের পর পর্যটকদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে হয়।

সুন্দরবনে প্রতি মৌসুমেই সাধারণত দেড় থেকে দুই লাখ দেশি-বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে। এ থেকে দুই কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আদায় হয়। দেশের অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হচ্ছে সুন্দরবন। যাকে ঘিরে মানুষের রয়েছে অনেক আগ্রহ। সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগেই মানুষ এখানে আসছে ঘূরতে। পর্যটনের বিরাট সভাবনা রয়েছে এখানে। তবে এখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকারি উদ্যোগ কর্ম।।

সুন্দরবনে পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও নাজুক। প্রতিটি লক্ষে মাত্র দুই জন করে বনরক্ষী দেওয়া হয়। বনরক্ষীরা বয়স্ক ও তাদের অস্ত্র চালানোর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। পর্যটকদের আবাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাদের লক্ষ বা বোটের মধ্যে রাত কাটাতে হয়। পর্যটকদের বহনকারী লক্ষ বেঁধে রাখার মতো ভালো ব্যবস্থা নেই। বন বিভাগের জেটিতে লক্ষ বাঁধতে দেয় না। ফলে মাঝ নদীতে নোঙ্গ করে রাখতে হয়। তবে আশার বিষয় হলো- বিদেশি পর্যটক টানতে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন অঞ্চল ঘিরে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার এর আওতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধসহ গোপালগঞ্জ থেকে বাগেরহাট ও খুলনা সুন্দরবন এলাকায় বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।

দ্য ওয়েব ক্রুজের মালিক আবুল ফয়সাল মো।
 সায়েম পর্টিন বিচ্ছাকে বলেন, শীতকালে
 পর্টিকরা সুন্দরবনে বেশি ভ্রমণে আসেন। এজন্য
 এই সময়ে পর্টিকদের প্রচুর চাপ থাকে। জুন-
 জুলাই-আগস্ট- এই তিন মাস ভ্রমণ নিষিদ্ধ। এই
 সময় মূলত বর্ষাকাল। বাকি সময়গুলোতে ট্যুর
 পরিচালনা করা হয়। তবে খুব কম। সরকার যদি
 তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় তবে সারা বছরই
 ভ্রমণ পরিচালনা করা যাবে।

শীতে প্রচুর পর্টিকের সমাগমের কারণে পরিবেশের
 ওপর কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা জানতে চাইলে
 তিনি বলেন, পর্টিকদের কারণে বর্তমানে
 সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর কোনো
 প্রভাব পড়ছে না। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আগে
 ঢাকাসহ বিভিন্ন থেকে জায়গা থেকে স্যালো
 ইঞ্জিনিয়ালিত নৌকায় করে সুন্দরবনে ঘুরতে আসত।
 মাইকে উচ্চ শব্দে গান বাজত। স্যালো মেশিনের
 শব্দ হতো। একসঙ্গে ৩০০-৪০০ পর্টিক আসত।
 এতে পরিবেশের ক্ষতি হতো। কিন্তু এখন সেই
 সুযোগ নেই। এখন সুন্দরবনে ইঞ্জিনিয়ালিত নৌকায়
 ভ্রমণ নিষিদ্ধ। একটি জাহাজে ৭৫ জন পর্টিকের
 বেশি ভ্রমণ করা যায় না। এছাড়া নদীতে কোনো
 ধরনের ময়লা আবর্জনা, বেতল ফেলা হয় না।
 জাহাজের মধ্যেই সরকিছু করা হয়।

তিনি আরও বলেন, সুন্দরবনে প্রচুর বিদেশি পর্টিক
 ভ্রমণ করতে আসেন। বিদেশি নাগরিক হওয়ায়
 দেশীয় পর্টিকের তুলনায় তাদের গুণতে হয় অনেক
 বেশি টাকা। এজন্য সুন্দরবনে বিদেশিদের ভ্রমণ ফি
 কমানোর দাবি জানিয়েছেন আবুল ফয়সাল মো।
 সায়েম।

তিনি আরও বলেন, তিনদিন সুন্দরবন ভ্রমণে একজন
 বিদেশি পর্টিকের কাছ থেকে নেওয়া হয় ১১ হাজার
 টাকা। অপরদিকে দেশীয় পর্টিকের কাছ থেকে
 নেওয়া মাত্র ১১শ' টাকা। প্রচুর বিদেশি পর্টিক
 সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন। তারা হয় তো বেশি টাকা
 দিয়েই ভ্রমণ করছেন। তবে ফির পরিমাণ কমানো
 হলো তাদের জন্য ভ্রমণ আরও সহজ হবে বলে মনে
 করেন ওয়েব ক্রুজের এই মালিক।

সুন্দরবন ভ্রমণকে পরিবেশবান্ধব করার বিষয়ে
 বেশকিছু মতামত দেন আবুল ফয়সাল মো। সায়েম।
 তিনি বলেন, জাহাজ থেকে কোনো ধরনের ময়লা
 আবর্জনা ফেলা যাবে না। ফেললে এ ক্ষেত্রে
 জরিমানা বিধান চালু করা উচিত।

এমভি ভেলার মালিক রফিকুল ইসলাম নাসিম
 বলেন, আমরা অস্ট্রেল থেকে মার্ট পর্যন্ত সাধারণত
 ট্যুর পরিচালনা করি। বাকি সময়গুলো নিয়মিত ট্যুর
 করা হয় না। বর্ষাকালে নিষেধাজ্ঞ থাকায় ট্যুর
 পরিচালনা করা হয় না। তবে বর্ষায় সুন্দরবনের
 অন্যরকম সৌন্দর্য থাকে। এই সময় ভ্রমণ পরিচালনা
 করতে পারলে অনেক ভালো হতো।

তিনি বলেন, সুন্দরবন ভ্রমণে বিদেশিদের জন্য
 অনেক ব্যয়বহুল। এছাড়া অপরিকল্পিত ভ্রমণ
 ব্যবস্থাপনার কারণে বিদেশি পর্টিকদের আগ্রহ
 অনেক কমে গেছে।

দেশের পর্টিন শিল্পের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠন
 ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের
 (টোয়াব) এই সদস্য বলেন, আমরা শুরু থেকেই
 পরিবেশবান্ধব ভ্রমণ পরিচালনার চেষ্টা করছি। তবে
 সুন্দরবনকে যেন পিককি স্পটে পরিণত করা না
 হয়। যেমন- লঞ্চ ভরে আসলাম, ডিজে পার্টি করে
 আবার চলে গেলাম। সুন্দরবন ভ্রমণের জায়গা,
 গবেষণার জায়গা, এটা যেন গণস্পটে পরিণত না
 হয়।



ট্যুর পরিচালনায় কাঠামোগত সমস্যার কথা উল্লেখ
 করে তিনি বলেন, সিগন্যাল বাতি না থাকায় রাতে
 লঞ্চ চলাচলে সমস্যা হয়। জাহাজ নোঙ্গের করার
 জায়গা নাই, পন্টুন নাই। পর্যাপ্ত জনবল নাই, ফরেস্ট
 গার্ড নাই।
 নাসিম মনে করেন, সুন্দরবন ভ্রমণ পরিচালনায়
 শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা দরকার। কারণ সুন্দরবনকে
 কল্পবাজারের মতো বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। এটা যেন
 না হয়। বিদেশিদের যাতে আরও সুন্দরবন ভ্রমণে
 আগ্রহ জন্মায় সেজন্য ট্যুর পরিচালনায় আরও সুন্দর
 ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

পর্টিন বিশেষজ্ঞ মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, প্রতিবছর
 লাখে পর্টিক সুন্দরবন দেখতে যান। এই অনন্য
 বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের টেকসই পর্টিন ব্যবস্থাপন
 এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
 তিনি বলেন, সুন্দরবনে শীতকালে পর্টিকদের প্রচুর
 চাপ থাকে। শীত ছাড়া বছরের অন্য সময় বিশেষ
 করে বর্ষায় ভ্রমণ পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট
 কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় নিতে পারে। তবে পরিবেশের
 ওপর যেন প্রভাব না পড়ে। বিদেশিদের সুন্দরবন
 ভ্রমণে অতিরিক্ত ফি'র বিষয়টি ও বিবেচনার আস্থান
 জানান তিনি। ◆



REDISCOVER HARMONY

Room Heaven Package
BDT 11,000 Net.

Package Benefits:

- Stay at Deluxe Room
- Buffet Breakfast for 2 persons
- Use of Swimming Pool & Health Club
- 50% Discount on Laundry Services

*Valid till December 31, 2022

For reservations visit - www.intercontinental.com/dhaka
or
call +880 2 55663030

CHICAGO

WASHINGTON

NEW YORK

BORDEAUX

LONDON

DHAKA

PARIS

MARSEILLE

DAVOS

DUBAI

KOH SAMUI

SINGAPORE

Live the InterContinental life


INTERCONTINENTAL
DHAKA



উত্তরবঙ্গের পর্যটন: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের পর্যটন ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ একটি অন্যত্ব।

মো. জিয়াউল হক হাওলাদার
বাংলাদেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহের মধ্যে
সর্বোচ্চ সংখ্যক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক
ও ঐতিহাসিক পর্যটন আকর্ষণ বাংলাদেশের
উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে
বিদ্যমান। রংপুর বিভাগ বৃহত্তর রংপুর ও
দিনাজপুরের আটটি জেলা নিয়ে গঠিত। এই আটটি
জেলায় দুই শাঠাধিক পর্যটন আকর্ষণ রয়েছে।
পুরাকীর্তির অনেক নির্দশন খোঢ়ানকার অতীত
সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—
এই অঞ্চলের জনপদ অতীত থেকেই সমৃদ্ধ এবং
খোনে অনেক রাজা, মহারাজা ও জমিদারদের
বসবাস ছিল। এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক
ও ধর্মীয় অনেক স্থাপনা রয়েছে, যার অনেকগুলোই
আমাদের অজানা। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগে
রাজশাহীসহ মোট আটটি জেলায় মোট ২০৫টি
প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্থান
রয়েছে। যমুনা, তিস্তাসহ অন্যান্য নদী এবং এর
শাখাপ্রশাখা বিহোত পুরো রংপুর অঞ্চল এক সময়
অনেক নদীবন্দর সমৃদ্ধ ছিল, যেখান থেকে পণ্যবাহী
নৌকা দুরদূরান্তে চলাচল করত। কালের আবর্তে যার
অধিকাংশই হারিয়ে গেছে বা গুরুত্বহীন হয়ে
পড়েছে। দিনাজপুর জেলার মাইলের পর মাইল
বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত্র এলাকার ধান চাবের প্রাচুর্যকে
ইঙ্গিত করে। দিনাজপুর এখনো চাল উৎপাদনে উল্লিক

রংপুর বিভাগের উল্লেখযোগ্য পর্যটন
স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে— বৃহত্তর
রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি,
কেরামতিয়া মসজিদ ও মাজার,
লালদীঘি নয় গম্বুজ মসজিদ, ৬৯
হিজরির প্রাচীন মসজিদ, চিনি মসজিদ,
রকস মিউজিয়াম এবং বৃহত্তর
দিনাজপুরের কাস্তেজির মন্দির,
রামসাগর, সীতাকোট বিহার, সুরা
মসজিদসহ আরও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক,
ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত
স্থান। এই বিভাগের শতরঞ্জি এখন
পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত।

এলাকা। এখানকার উৎপাদিত চাল স্থানীয় চাহিদা
প্রৱণ করে দেশের অন্যান্য অংশের প্রয়োজন
মেটায়। দিনাজপুর জমিদারি বাংলার প্রাচীন
জমিদারসমূহের অন্যতম। জনপ্রবাদ অনুসারে,
জনেক দিনরাজ বা দিনরাজা এই জমিদারির
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তার নামানুসারে এই জেলার
নামকরণ হয় দিনাজপুর। তবে অন্য মতে, পঞ্চদশ
শতকে বিখ্যাত রাজা গামেশ এই জমিদার বিশে

প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীমত দন্ত চৌধুরী এই
জমিদার বিশের খ্যাতিমান জমিদার ছিলেন। এরপর
মহারাজা প্রাণনাথ (সুখদেবের পুত্র) ও তার দন্তকপুত্র
রামনাথ জমিদারি পর্যালনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন
করেন এবং তারাই ছিলেন বিখ্যাত কাস্তেজির নবরাত্র
মন্দিরের নির্মাতা। রাজা গিরিজানাথ (তারকানাথের
দন্তক পুত্র) ছিলেন এই জমিদার বিশের একজন
সুশিক্ষিত ও স্বামধন্য জমিদার। ১৯১৯ সালে রাজা
গিরিজানাথ মৃত্যবরণ করার পর তার দন্তক পুত্র
জগদীশনাথ ছিলেন এই বিশের সর্বশেষ জমিদার।
১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে দিনাজপুর রাজপ্রাসাদ ও
কাস্তেজির মন্দির মারাত্কারাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজা
গিরিজানাথ পুনঃনির্মাণ করেন।

রংপুর বিভাগের উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানসমূহের
মধ্যে রয়েছে— বৃহত্তর রংপুরের তাজহাট জমিদার
বাড়ি, কেরামতিয়া মসজিদ ও মাজার, লালদীঘি নয়
গম্বুজ মসজিদ, ৬৯ হিজরির প্রাচীন মসজিদ, চিনি
মসজিদ, রকস মিউজিয়াম এবং বৃহত্তর দিনাজপুরের
কাস্তেজির মন্দির, রামসাগর, সীতাকোট বিহার, সুরা
মসজিদসহ আরও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক
ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান। এই বিভাগের
শতরঞ্জি এখন পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত। রংপুর শহরের
উপকণ্ঠে সেনানিবাসের পশ্চিমে ঘাঘট নদীর তীরে
নিসবেতগঞ্জ নামক স্থানে আবস্থিত রংপুরের বিখ্যাত
ও ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পকারখানা। বর্তমান বিশে

বুনন শিল্পের মধ্যে ‘শতরঞ্জি বুনন’ সবচেয়ে প্রাচীনতম। এই পণ্য উৎপাদনে কোনো প্রকার যান্ত্রিক ব্যবহার নেই। কেবলমাত্র বাঁশ ও রশি দিয়ে মাটির ওপর সুতা দিয়ে টানা প্রস্তুত করে প্রতিটি সুতা হাত দিয়ে নকশা করে শতরঞ্জি তৈরি করা হয়। কোনো জোড়া ছাড়া যে কোনো মাপের শতরঞ্জি তৈরি করা যায়। এর সৌন্দর্য ও টেকিসই উল্লেখ করার মতো। ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, অযোদ্ধশ শতাব্দী থেকে এই এলাকায় শতরঞ্জির প্রচলন ছিল। জানা যায়, মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে শতরঞ্জি ব্যবহার করা হতো। এক সময় ভারত, সিংহল, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে এখান থেকে প্রচুর শতরঞ্জি রপ্তনি হতো। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন এখানে শতরঞ্জি বুননের জন্য শতরঞ্জি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে। শতরঞ্জি বুনন দেখার জন্য সারাবছর অনেক দেশ-বিদেশ দর্শনার্থী এখানে আসেন। রংপুরের কারুশিল্পের মধ্যে শতরঞ্জি ছাড়াও পটশিল্প, বেশম, তাঁত, ঘৃতশিল্প, নকশিকাঁথা, বাঁশ শিল্প, কাঠ শিল্প, কাঁসা, পিতল, লোহ শিল্প ও টেকি শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভাওয়াইয়া রংপুরের লোকসংগীত ধারার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ শাখা। লোকসাহিত্য ও লোক সংস্কৃতিতে রংপুরের অবদান অত্যন্ত গ্রহণস্নায়। আব এসব কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে রংপুরের অঞ্চলিক ভাষায়। আঞ্চলিকতার দিক দিয়ে ভাওয়াইয়া হচ্ছে ভাটিয়ালির বিপরীত ধারার লোকসংগীত।

ভাওয়াইয়া স্মার্ট আববাসউদ্দীন ১৯৫৪ সালে

ভাওয়াইয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত করেন।

ভাওয়াইয়া লোকসংগীতের ধারায় এই অঞ্চলের গামীগ জনপদের বিভিন্ন পেশার মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-বেদনাকে কেন্দ্র

করে লোকের মুখে মুখে রচিত এবং আবেদনময় সুরে বাঁশি ও দোতরা বাদ্যযন্ত্রযোগে গীত হয়ে আসছে। ‘ভাৰ’, ‘ভাওয়া’, ‘বাওয়া’, ‘বাউদিয়া’ প্রচৃতি শব্দ থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি বলে গবেষকরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গানগুলোর মধ্যে –ওকি গাড়িয়াল ভাই, ওকি ও কাজল ভোমরা, তোরসা নদীর ধারে, নাইওর ছাড়িয়া যেও মোর বক্সু, নদী না যাই ওরে বৈদে, ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দে রে উল্লেখযোগ্য। রংপুরের বিভাগের লোকসংস্কৃতি ও সংগীতের ধারায় মেয়েলি গীত বা যোরের গীত একটি উল্লেখযোগ্য উৎসাহ। রংপুরের মেয়েলি গীত মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানের অনেক বিষয় নিয়ে রচিত। যেমন- বিয়ে, সাধারণকল, অনুপ্রাসন, নবজাতকের ক্ষেত্রে কাজসহ যিয়ের বিভিন্ন পর্যকে ঘিরে এই গীতগুলো রচিত এবং ন্যূন্যত্যোগে আনন্দমুখরতার মধ্য দিয়ে গীত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। রংপুরের লোকসংগীতের ধারায় আরও আছে হৃদমার গান, জগের গান, যোগীর গান, গোয়ালীর গান, ক্ষ্যাপা গান, জারি গান, মালশা গান, পালাগান বা কাহিনি গান। এই ধারায় রয়েছে অসংখ্য পালাগান। যেমন- নসিমন সুন্দরীর পালা, গুনাইবিবি, অমমলা কন্যা, নেকেবিবি, কলিরাজা, চিতুবিনু ইত্যাদি। রংপুরের লোকসংগীতের ধারায় আছে– রংপুরের ভায়ায় ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা (ছিলকা)। বাংলাদেশের যে কয়টি জেলায় জাতিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় দিনাজপুর তার মধ্যে অন্যতম। এই জেলায় সাঁওতাল, উড়াও, মাহালী, মণ্ডলী, কেলকামার, মুশহর, তুড়ি, রাজবংশী, কড়া, ভুইয়া, মুচি, মালে, মাহাতো, রবিদিস, পাহাড়ি, কামার, কর্মকরসহ হৱাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১৩ লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করে। দিনাজপুর জেলা লিচুর জন্য বিখ্যাত। এই জেলায় বাংলাদেশের সেরা লিচু উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন জাতের লিচুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদ্রাজি, বোঁহাই, বেদনা, মোজাফফরি ও চায়না-৩। বেদনা লিচুর বিচি হোট এবং মাসল ও সুমিষ্ট হয়। বেদনা লিচু ও মোজাফফরি লিচুর দাম সবচেয়ে বেশি।

স্থানীয়ভাবে এগুলো প্রতিশি ৬০০-৭০০ টাকা দামে বিক্রি হয়। এই জেলায় লিচু চাষে ব্যবহৃত ৩৭০৫ একর জমির অধিকাংশই বিরল ও দিনাজপুর সদর উপজেলায়। দেশে-বিদেশে এখানকার লিচু বিশেষভাবে সমাদৃত। রাজশাহী-রংপুর অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী আমসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশের মাটিতে বিপুল সংভাবনায় আরেকটি আমের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছে যার নাম ‘ইঁড়িভাঙ্গা’।

আশুবিহীন সুমিষ্ট এই আমের কদর ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানেও উত্তরোত্তর বৃক্ষি পাচ্ছে। পর্যটকগণ আমের মৌসুমে এখানে এলে এই আমের স্বাদ পরখ করে দেখতে পারেন। রংপুর জেলা তামাক চাষের জন্য বহু আগে থেকেই বিখ্যাত। বিশেষত দেশ স্বাধীনের পর সন্তুর দশকের শুরু থেকে এ এলাকায় তামাক চাষ বিস্তৃত লাভ করে। অনুকূল মাটি ও জলবায় এবং উৎপাদন লাভজনক হওয়ার কারণে রংপুর সদর, হারাগাছ, তারাগঞ্জ ও গঙ্গাচড়া উপজেলায় ব্যাপক হারে তামাক আবাদ হয়। রংপুর জেলার প্রায় আড়াই হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হয়ে থাকে। তবে স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে ইদানিং চাষিদের মাঝে তামাক চাষের প্রবণতা কমতে শুরু করেছে।

রাজশাহী বিভাগ সুদূর অতীত থেকেই সমৃদ্ধ এবং তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। বগুড়ার মহাস্থানগড় আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ের সমৃদ্ধ জনপদ পুনর্বৰ্ধন নগরীর প্রচুর নির্দশন দেখতে



পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দিতে নির্মিত নওগাঁর পাহাড়পুর বৌকবিহার এবং আনন্দ বৌকমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাল রাজবংশের কয়েক শতাব্দির সঙ্গীর শাসনকালের পরিচয় বহন করে। তাছাড়া সমগ্র রাজশাহী অঞ্চলে অসংখ্য প্রাচীন মাজার ও মসজিদের বিস্তার থেকে এটি পম্পণিত যে, বিশেষত পাল শাসনামল এবং তৎপুরবর্তী সুলতানি আমলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অনেক আউগিয়া, দরবেশ ও সুফি সাধক ইসলামের শাস্তির বাণী প্রচারের জন্য এই ভূখণ্ডে এসেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামল এবং তৎপুরবর্তী সময়ের রাজবাড়ি ও প্রাসাদের ব্যাপক উপস্থিতি হিন্দু, মুসলিম রাজা, মহারাজা, নবাব ও জমিদারদের অতীত আধিপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া সারা রাজশাহী বিভাগে অসংখ্য হিন্দু মন্দির ও মঠের উপস্থিতি থেকে রাজা ও জমিদারদের প্রভা-প্রতিপন্থির পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দিতে আগত ইউরোপীয় খ্রিস্টিন মিশনারিদের আগমনের পর এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে নির্মিত গির্জার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ সকল অতীত সমৃদ্ধি ও সভ্যতার অরেক নির্দশনই কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে।

রাজশাহী বিভাগের উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে- ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবন্ন নওগাঁর বৌকবিহার ছাড়াও কুসুম মসজিদ, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও মাহিসওয়ারের মাজার, রাজশাহীর পুঁথিয়া রাজবাড়ি, বাঘা মসজিদ ও বরেন্দ্র জাতীয়গর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, নাটোরের উত্তরা গণভবন, পাবনার তাড়াশ জমিদারবাড়ি ও ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আশ্রম এবং সিরাজগঞ্জের হ্যারত মখদুম শহদৌলার মাজার ও রবীন্দ্র কাচারিবাড়ি এবং গুঁটীরা গান ইত্যাদি।

গুঁটীরা রাজশাহী এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকসংগীত। গুঁটীরা মানে সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে তার সমাধান বলে দেওয়া। ‘নানা-নাতির’ ভূমিকা নিয়ে দুজন ব্যক্তি সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে গুঁটীরা গান পরিবেশন করে। আঝিলিক ভাষায় রচিত সংলাপ ও সমসাময়িক কোনো বিষয়ে গুঁটীরা গানের মূল উপজীব্য। নানা-নাতির নাচ, গান, কৌতুক, অভিনয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে পরিবেশনের কারণে গুঁটীরা গান খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠে। রাজশাহী বিভাগ বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ নানাজাতের রসালো আমের জন্য বিখ্যাত। চাঁপাইনবাবগঞ্জকে আমের রাজধানী বলা হয়। বাংলাদেশে যতগুলো ফল উৎপন্ন হয় স্বাদ, গন্ধ ও উৎপাদনের দিক থেকে আমের অবস্থান শীর্ষে। এজন্য একে ফলের রাজা বলা হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৮ লাখ টন আম উৎপাদিত হয়।

এর মধ্যে শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে ২ লাখ

বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৮ লাখ টন আম উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে ২ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে বিভিন্ন জাতের আম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে ওঠে গোপালভোগ। তারপর আসে হিমসাগর বা ক্ষিরসাপাত। এরপর ল্যাংড়া এবং একের পর উঠতে থাকে ক্ষিরভোগ, মোহনভোগ, রাজভোগ, রানিভোগ, রানিপছন্দ, সিন্দুরা, সুবর্ণরেখা, নাক ফজলি, ফজলি, চিনি ফজলি, সুরমাই ফজলি, চিনি মিসরি, জগঞ্মোহিনী, রাখালভোগ, গোবিন্দভোগ, তোতাপুরী, আশ্রমালি, চম্পা, সুর্যপুরি, লক্ষণভোগ, কিয়াগভোগ, আশ্বিনা, ভাদুরিগুঁটি, ক্ষিরমণ, দুধসর, মলিকা, রাজলক্ষ্মী, দুধকুমারি, বিন্ধাবনি ইত্যাদি নানা আকৃতি ও নানান স্বাদের আম। রাজশাহীর তিলের খাজা সুবিখ্যাত এর মোলায়েম ও মচমচে স্বাদের জন্য। রাজশাহী ছাড়া, কুষ্টিয়ার তিলের খাজারও বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।

রাজশাহী জেলার চারবাট থানার হলদিগাছীতে উন্নতমানের তিলের খাজা প্রস্তুত হয়। চিনি বা গুড় এবং তিল সহযোগে তৈরি হয় মচমচে স্বাদের তিলের খাজা। প্রথমে তিল নিয়ে কড়াইতে তেল ছাড়া হালকা আঁচে বাদামি করে ভাজতে হয়। এরপর চিনি বা গুড় সামান্য পানির সাথে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে পেস্ট বা ক্যারামেল তৈরি করে তাতে ঢেলে দিয়ে মুদু আঁচে নাড়তে হয়। এরপর মিশণটি একটি

সমতল স্থানে পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে তার ওপর বেলন দিয়ে চ্যাপ্টা করে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এলে ছুরি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। এভাবে পুরো ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তৈরি হয় মচমচে সুস্বাদু তিলের খাজা। রাজশাহীর পান বাংলাদেশের নামকরা পান। বিয়েশাদি, পূজা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়ন ও রসনা তৃষ্ণিতে রাজশাহীর পানের বেশ কদর রয়েছে। ঝাঁঁখাইন ও রসালো রাজশাহীর পান সবার কাছে পছন্দনীয়। রাজশাহীতে জেলাতে ২৫ হাজারের অধিক পানের বরজ রয়েছে। নিঃশ্বাসকে সুরক্ষিত করা এবং টেক্ট ও জিহবাকে লাল করা ছাড়াও মনে প্রফুল্ল আনার জন্য রাজশাহীর পান প্রসিদ্ধ। রাজশাহীতে এক পোয়া অর্ধাং ও ২২ বিড়া (৬৪টি পানে এক বিড়া) বড় পানের দাম প্রায় চার হাজার টাকা। রাজশাহীতে বার্ষিক উৎপাদিত পানের দাম বর্তমান বাজার মূল্যে ১০০ কোটি টাকার ওপরে।

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী শহরে অবস্থিত। বাংলার তৃকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৩ সালে স্থানীয় জাদুঘরগুলোর সংগঠকদের প্রত্ততত্ত্ব সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেন এবং ১৯১৬ সালে তিনি এই জাদুঘর বরেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এই জাদুঘর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে- বহু মূল্যবান পাথর ও ধাতু নির্মিত ভাস্কর্য, খোদিত লিপি, মুদ্রা, মৃৎপত্র পোড়ামাটির ফলক, অন্তর্শস্তু, আরবি ও ফারসি দলিলপত্র, চিত্র, বইপত্র ও সাময়িকী এবং সংস্কৃতি ও বাংলা পাণ্ডুলিপি। রাজশাহী বেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই বেশম বাজারই প্রথম ইউরোপীয় বণিকদের বাংলায় আসতে আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেশম কারখানা রাজশাহী শহরের বালিয়াপুকুর নামক স্থানে অবস্থিত। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, সংস্কৃত শতাব্দীতে প্রথম চীন দেশে রেশম চাষ শুরু হয়। এক সময় এই দেশে উৎপাদিত রেশম স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার পরও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তনি করা হতো। রেশম শাড়ি বাঙালি রমণীর ঐতিহ্যগত সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক স্বত্ত্বের প্রতীক। রেশম কাপড়ের বিভিন্ন ডিজাইন ও ধরন- গরদ, মটকা, বেনারসি প্রভৃতি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রত্তত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মিলে চার শতাব্দিক পর্যটন আকর্ষণ রয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকরা বংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য অবলোকনের জন্য বেড়াতে আসেন। তবে এই সব আকর্ষণ দেশে-বিদেশে আমাদের আরও বেশি প্রচার করতে পারলে প্রতিবছর লাখ লাখ বিদেশি পর্যটক বেড়াতে আসবেন।

লেখক: ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ◆

অপর্যাপ্ত বাংলার অনন্য সৌন্দর্য দর্শনে বেরিয়ে পড়ুন এখনই—
আপনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনার অপেক্ষায়
ঢাঁকা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন



মহিমা
মজিল



।।বিদেশ ভ্রমণ করার আগে নিজের দেশ ভ্রমণ করুন!!
।।দেশকে জানুন, পর্যটনের অতিথেয়োত্তা এবং জীবন্ত!!



আপনার নিয়ন্ত্রিত আবাসন এবং সুবাদু খাবারের নিষ্ঠ্যতা



visit
bangladesh
পর্যটন মোডেল হোটেল



পর্যটন মোডেল হোটেল



পর্যটন মোডেল হোটেল

ফোন: +880-1642-27, ফটো: +880-1642-27
ইমেইল: reservation@tourism.gov.bd.

পর্যটন মোডেল হোটেল, পর্যটন মোডেল
প্রযোজন নথি প্রস্তাবিক নথি, মোড়-১২৩৪।

ঢাঁকা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
জাতীয় পর্যটন প্রকল্প | www.visitbangladesh.gov.bd



প্রতিদিন নৌ বিহার বুকিং চলছে

শীতলক্ষ্য, মেঘনা ও বুড়িগঙ্গায়

উদ্ভোগ করুন

ডিনার ক্রুজ (বিকাল ৪:০০ - রাত ৮:৩০)

মরিং ক্রুজ (সকাল ৯:০০ - বিকাল ৩:০০)

ডে লং ক্রুজ (সকাল ৯:০০ - বিকাল ৫:০০)

কল্পারেট ইণ্ডেন্টস ও পিকনিক, ক্রেয়ারওয়েল ডিনার
ফ্যামিলি আউটিংসহ সকল উৎসবে



DHAKA DINNER CRUISE
www.dhakadinnercruise.com



যোগাযোগঃ ০১৮১৯২২৪৫৯৩
০১৭৩০৪৫০০৯৯

ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র সৈকতে

কল্পনা

■ মার্জিয়া লিপি

ইচ্ছেটা অনেকদিন ধরেই ছিল- ২০১৮ এর অক্টোবরে মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়ার বালি অভিযানের জন্য। ক্রিসমাসের ছুটিসহ ১২ দিনের একটি অমগ সূচি খসড়াও শেষ করি। মালিন্দে এয়ারলাইনে টিকিট বুকিং করি। পরিকল্পনার প্রথম চারদিনের সূচিতে ছিল- মালয়েশিয়া ভ্রমণ। বালির জন্য নির্ধারিত ছিল পরবর্তী আটদিন। সফরসঙ্গী ছিল শুরুতে সাতজন, পরবর্তীতে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০-এ। মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া সফরে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য দ্রুবিড়ের বয়স সাড়ে চার আর বয়োজ্ঞেষ্ঠ সদস্য বিশ্বজিৎ ভাবুড়ী দাদার বয়স ৫৪। সহকর্মী রঞ্জল ভাইকে দেশে রেখেই আমরা পাড়ি দিই মালয়েশিয়া। উড়াল জাহাজের টিকিট কিনেও অফিসের কাজের জন্য রুহুল ভাইয়ের আর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। অমগ সূচিতে স্থির হলো- ৩১ ডিসেম্বর বালিতে থাকা। ইন্দোনেশিয়ার কুটা বিচের বিখ্যাত আত্মস্বাক্ষর অনন্দ কোনোভাবে বঞ্চিত হতে চাইনি। পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপের দেশগুলোর অন্যতম ইন্দোনেশিয়া। বালি, ইন্দোনেশিয়ার তেমনি একটি অস্তন্ত দ্বীপ রাজ্য। ১৩ হাজারের বেশি দ্বীপপুঁজি সমূক্ষ জীববেচিত্র্য আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে অনন্য এই দেশটি। সবচেয়ে বড় ফুল র্যাফলেশিয়া অ্যারনোল্ডো আর গ্রেটার বার্ডস অব প্যারাডাইসের জন্য বিখ্যাত।

গ্রিক ভাষায় ইন্দোস আর মেসেস থেকে উৎপন্ন ইন্দোনেশিয়া; যার অর্থ ইভিয়ান আইল্যান্ড। প্যাসিফিক রিং অব ফায়ার- এ অবস্থিত দেশটির মাটি ভু-গঠনিকভাবে খুব অস্ত্রিত। ৪০০টি আগ্নেয়গিরির রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। এর মধ্যে ১৩টিই সক্রিয়। গত কয়েক বছরে আগ্নেয়গিরির বিফোরণ আর সুনামির কারণে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এই দেশটি বার বার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক বেশি। বছরে দুটি খাতু দেখা যায় বর্ষা ও শুক্র। বিষুব রেখা বরাবর অবস্থিত দেশটির তাপমাত্রা খুব বেশি উষ্ণ বা শীতল নয়। ৩৪টি প্রদেশ রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায়। এর মধ্যে জাভা, বালি এবং লুঞ্চক আয়তনের দিক থেকে বড়। বালিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাল দ্বীপ- নুসা পেনিডা, নুসা লেন্দানগান, নুসা কেনিসন ইত্যাদি। পাশেই রয়েছে লুঞ্চক প্রদেশের বিখ্যাত আরও কিছু দ্বীপ। এসব দ্বীপের প্রত্যেকটির স্থত্ত্ব সংস্কৃতি আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দিনে-রাতে কমপক্ষে তিনিমার এসব প্রবাল দ্বীপের সৌন্দর্য আর বৈশিষ্ট্য বদলে যায়। সূর্যোদয়ের পর স্লিপ্স আর রাতের আলো-আঁধারের নিরবরাতায় দ্বীপ রাজ্য মেন সৌন্দর্যের ভিত্তি পসরায় নিজেকে সাজায়। বালি অভিযানে অধিকাংশ পর্যটকই অভিযানের তালিকায় দ্বীপ-নুসা লেন্দানগান, নুসা পেনিডা এবং গিলি ট্রায়ানগানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমাদেরও সাতদিনের বালি পর্বের ভ্রমণ সূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল- কুটা আর উবুদের বিভিন্ন দর্শনীয় মন্দির- তানাহলট, উল্যাতু, নুসা দুয়া সমুদ্র সৈকত, ড্রিম বিচ, পাদাঙ্পাদাঙ সিঙ্কেট সমুদ্র সৈকত, জিমবারান বিচে সামুদ্রিক মাছে ক্যানেল ডিনার, থার্টিফার্স্ট নাইটে কুটা বিচের আত্মস্বাক্ষর, উবুদের



রাইস ট্রেরেস, আর্ট গ্যালারি, কফি প্ল্যানটেশন, ট্রাবাঙ্গন জলপ্রপাতা, জীববন্ত আগ্নেয়গিরি- কিন্তুমানি, মাংকি ফরেস্ট, বার্ড জু ইত্যাদি। দ্বীপের তালিকায় রেখেছিলাম নুসা লেন্দানগান, নুসা কেনিসন, নুসা পেনিডা এবং গিলি ট্রায়ানগানকে।

অভিযানের শুরুতে খুব উত্তেজনায় ছিলাম বালির কোরাল দ্বীপ অভিযান এবং পানির নিচের বিভিন্ন এক্সিভিটিভ নিয়ে। স্কুবা ড্রাইভিং, স্লোরকেনিংয়ের জন্য বালি এবং লুঞ্চকের গিলির দ্বীপ খুব বিখ্যাত।

পানির রাঙ্গে জীববেচিত্র্য অসাধারণ বর্ণিল ও অন্য রকম বিশ্বায়কর। অভিযানের ষষ্ঠি দিনে আমরা রওনা দিই নুসা লেন্দানগান থেকে নুসা পেনিডায়। বিখ্যাত ডাইনোসর বিচ বা কেলিংকিং বিচ নুসা পেনিডা দ্বীপের অন্যতম আকর্ষণ। নীলাভ-সবুজ পানি, সোনালি ঝাকঝাকে রোদ আর মাথন রঙের সাদা সৈকতে ডাইনোসর আকৃতির বিচটি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ও অনন্য।

নুসা লেন্দানগানে আসতে হয় কুটা রসেনোর বিচ থেকে বোটে। সৈকতের একেবারে কিনারায় অবস্থিত স্বপ্নের মতো সুন্দর একটি রিসোর্ট নুসা লেন্দানগানের মহাগিরি। প্রবাল দ্বীপে মহাগিরির সুইমিং পুলের পাশে কাঁচের মতো স্বচ্ছ নীল জলের পাশে রঙ বেরঙের আলোতে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে আমাদের অনন্দ আয়োজন।

অভিযানের পুরুষ মধ্যে রেখেই খুব ভোরে আমি আর সূর্য একটা

মোটরবাইক নিয়ে রওনা হই নুসা পেনিডার উদ্দেশে। সেদিন ছিল বালিতে ‘গালুনগন’ উৎসব। প্রতি ছয়মাস পর পুর্ণিমা তিথিতে ‘গালুনগন’ উৎসব পালিত হয়। দ্বীপের অধিবাসীরা রঙ বেরঙের বিভিন্ন পোশাক পরে মাথায় পুজার মৈবদ্য নিয়ে ভিড় করে বিভিন্ন মন্দিরে। বছর কয়েক ধরে এই দ্বীপটি অন্যরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে পর্যটকদের কাছে পরিচিতি পেয়েছে। মোটরবাইকে ৪৫ মিনিট যাওয়ার পর ইয়েলো ব্রিজের নিচে টিকিট কিনিঃ কাউন্টারের পাশে বাইক পার্ক করে রেখে খুঁজতে থাকি স্পিডবোটের টিকিট কাউন্টার। লাল রঙের এক লাখ মিলিয়ন রুপাইয়া দিয়ে টিকিট কিনিঃ যা বাংলাদেশের টাকায় মূল্যমান ৬শ’। মোটরবাইকের নম্বরসহ একটা ফটো তুলে রাখি। যেন ফিরতি পথে অসংখ্য কালো বাইকের রাজ্য থেকে নিজেদের বাইকটা খুঁজে পাই। রওনা করি স্পিডবোটে

নম্বরসহ একটা ফটো তুলে রাখি। যেন ফিরতি পথে অসংখ্য কালো বাইকের রাজ্য থেকে নিজেদের বাইকটা খুঁজে পাই। রওনা করি স্পিডবোটে। সবুজ রঙের পানির বুক চিরে রাজহংসীর মতো। আধা ঘণ্টার পানিপথ পাড়ি শেষে পেলোবন হারবারে নেমে পড়ি। পুনরায় আরেকটি বাইক ভাড়া নিই ভরপেট পেট্রোলসহ সতত হাজার রুপাইয়ার বিনিময়ে। অগ্রিম টাকা শোধ করে রওনা দেয়ার

পুরৈ মোটরবাইকের মালিক জানালেন ফেরার পর
তাকে না গেলে আমাদের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।
চাবি মোটরসাইকেলে রেখে চলে গেলেই হবে।
সেখানে নাকি একরকমই রেওয়াজ। একথা শুনে মনে
মনে তুলনা করলাম আমাদের দেশের চালচিত্রের
সঙ্গে।

মার্যাদা চলছি, পাহাড়ি উচ্চ-নিচু পথ বেয়ে। কিছু দূর
পর আবার পিচডালা রাস্তা, অনেকটা আমাদের
দেশের রাঙামাটি যাওয়ার রাস্তার মতোই। পথে
অনেক বিদেশি ও বিদেশিনিকে দেখলাম সুষ্ঠি ও
বাইক চালাচ্ছে। স্মার্টফোনে জিপিএস দেখে দেখে
পথ চলছে। মাঝে মধ্যে রাস্তা ভুল করে স্থানীয়
পথচারীদের জিজ্ঞেস করে আবার সঠিক পথের
সন্ধান করছি। প্রায় ঘন্টাখালিকে মোটরবাইকে চলার
পর রাস্তা ভুলে সামনের রাস্তায় চলে যাই। পুনরায়
তার চিহ্নিত সঠিক পথের সন্ধান খুঁজি। কিছুদূর
যাওয়ার পর রাস্তা কেখাও কেখাও বেশ ভাঙ।
স্থানীয় মানুষজন খুবই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবেরে।
পাহাড়ি রাস্তায় যদি বাইক চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা
না থাকে তবে অ্যাডেণ্ডেশনের না আসাই নিরাপদ।
প্রায় দেড় ঘণ্টা টানা গাড়িতে চড়ার পর দেখা
মেললো ডাইনোসর বিচ বা কেলিংকিং বিচের পার্কিং
এলাকার। নৃসা পেনিডার অন্যতম আকর্ষণীয়
সৈকতে প্রবেশের জন্য টিকিট কিনতে হয় ৫০
হাজার রুপাইয়ার বিনিময়ে। মোটরবাইক রেখে অন
পর্যটকদের অনুসরণ করে কিছু দূর যাওয়ার পরই
ভারত মহাসাগরের এক অনন্য সৌন্দর্যের সামনে
দাঁড়াই।

সবুজ গাছপালা পেরিয়ে সাদা সৈকতের পর
দিগন্তজোড়া স্বচ্ছ নীলাভ সবুজ রঙের সমুদ্র। অনেক
পর্যটক এখানে উপরিভাগের সৌন্দর্য দেখে চলে
আসেন। বালি অমরের প্রথম থেকেই আমার অনেক
ইচ্ছা ছিল ডাইনোসর বিচের সিক্রেট পয়েন্ট
দেখা। উপরিভাগ থেকে ডাইনোসর বিচের সৌন্দর্য
দেখে নিজেদেরকে আর বিরত রাখতে পারিনি।
সেদিন নুসা পেনিডায় কেলিংকিং বিচের উপরিভাগে
ছিল পর্যটকের জটলা। স্মার্টফোন আর ক্যামেরায়
বিভিন্নভাবে ছবি তুলে স্থৃতিতে রেখে দিচ্ছে রহস্যময়
সৈকতটিকে। সারা গায়ে উল্কি আঁকা ব্রাজিলের এক
বিখ্যাত মডেলের ফটোগুট চোখে পড়লো। পায়ে
হেঁটে নিচে নামার সময় কেউ বলছে ৪০-৫০ মিনিট
কেউ বা বলছে আবও কিছি বেশি

এভাবে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই
সিক্রেট বিচের জন্য রওনা হলাম।
পাহাড় বেয়ে কিছুদূর নিচে নামার প্র
গাছপালার মাঝখান দিয়ে ডাইনোসর
বিচে যাওয়ার জন্য পথ পেয়ে যাই।
কিছু পথ অতিক্রম করে দেখতে
দেখতে ডাইনোসরের মাথার দিকে
এগিয়ে যেতে থাকি। প্রথমে একটু
সহজই মনে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে
যাওয়ার পরই আসল রহস্যের শুরু
হয়। খুবই সরু পাহাড়ি পথ। কোথাও
মাটি কোথাওবা অসমতল পাথর।
মাঝে মধ্যে দুপাশ একদম ফাঁকা। শুধু
কিছু চিকন কাঠের লাঠি ও বাঁশ দিয়ে
সিঁড়ির হাতলের মতো করে বানানো।
কোথাও বেশ সরু পথটি। কোনো
রকমে দৃজন একসাথে যাওয়া যায়

সময় লাগবে। বার বার আমি সুর্যের মুখের দিকে
তাকিয়ে পাড়ি দিই দুর্গম পথ। এক পথ্যায়ে
নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলতে থাকি- ‘ভয়ের
কি আছে? আমাদের তো একদিনে ১৪ ঘণ্টা পাহাড়ে
ঁটার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ আর এমনকি!’
পাহাড় আর সমুদ্রের দুর্গম প্রকৃতির বন্য সৌন্দর্যের
বিমুগ্ধতা পৌঁছে যায় মনের গভীরে। প্রায় দেড় যুগ
পূর্বে হিমালয়ের শঙ্খ কাঞ্চনজঙ্গার সাথে প্রথম দেখা
দার্জিলিঙ্গে। এক দুর্নির্বার আকর্ষণ আর রহস্যের
চাঁদও যেন খুঁজে পাই হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্গায়।
সেই বছরই আমাদের প্রথম ট্রেকিংয়ের
অভিজ্ঞতা হয়। ঝুঁঝুয়াগ থেকে

ବ୍ୟାଙ୍ଗିତ ହେଲା ନୁହିଲା କାହାର ଦେଖିଲା

ମନ୍ଦାସୁନ୍ଦରୀ ପିଲାତିକ

ପୋଛେ ଗରୋହି

উত্তরাঞ্চলের

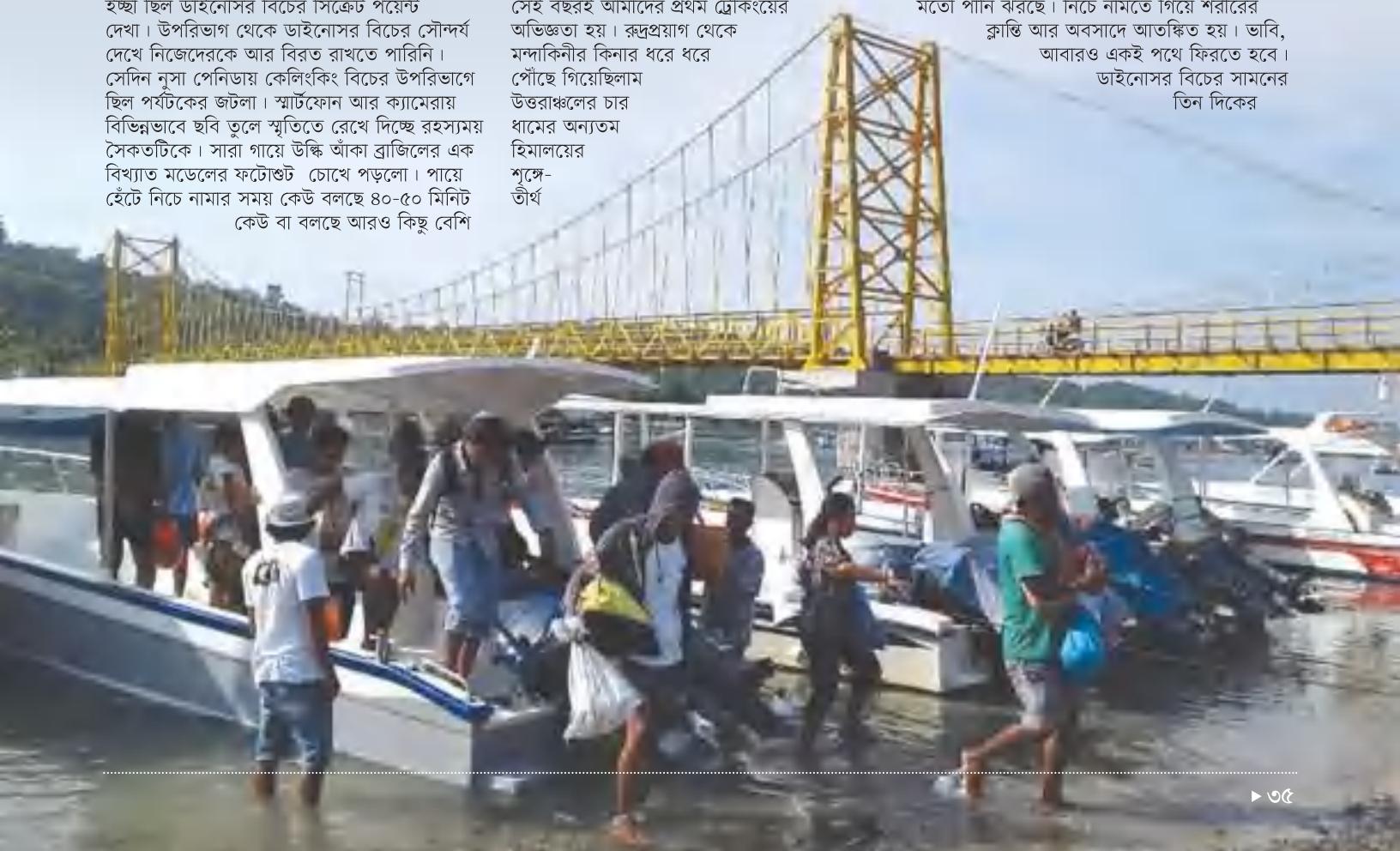
ମୁଦ୍ରଣ

一八二

কেদারনাথে । গৌরীকুণ্ড থেকে চড়াই উত্তোল পথে
২৮ কিলোমিটার পায়ে হাঁটার পথ । সেবার
হিমালয়ের শ্বেত শুভ শৈবতীর্থ কেদারনাথ শৃঙ্গকে
দেখছিলাম হাতের নাগালের দুরত্ব থেকে ।
এভাবে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই সিক্রেট বিচের
জন্য রওনা হলাম । পাহাড় বেয়ে কিছুদূর নিচে
নামার পর গাছপালার মাঝাখান দিয়ে ডাইনোসর
বিচে যাওয়ার জন্য পথ পেয়ে যাই । কিছু পথ
অতিক্রম করে দেখতে দেখতে ডাইনোসরের মাথার
দিকে এগিয়ে যেতে থাকি । প্রথমে একটু সহজই
মনে হয় । কিন্তু বিত্তীয় ধাপে যাওয়ার পরই আসল
রহস্যের শুরু হয় । খুবই সরু পাহাড়ি পথ । কোথাও
মাটি কোথাও বা অসমতল পাথর । মাঝে মধ্যে দুপুশ
একদম ফাঁকা । শুধু কিছু চিকন কাঠের লাঠি ও বাঁশ
দিয়ে সিঁড়ির হাতলের মতো করে বানানো । কোথাও
বেশ সরু পথটি । কোনো রকমে দুজন একসাথে
যাওয়া যায় । বিভিন্ন উচ্চতার এলেবেলে সিঁড়ি । মনে
হলো ভুটানে টাইগার নেটে যাওয়ার সময় ওপরে
উঠে ১৩শ' সিঁড়ি অতিক্রম করেছিলাম কিন্তু এবারের
অভিজ্ঞতা একেবারে ভিন্ন । সরু কাঠ আর বাঁশ ধরেই
সবাইকে নিচে নামতে হয়েছিল, পাথরের খাঁজে
খাঁজে কোথাও একটু প্রশস্ত পথ কোথাও বা পথে
থেমে অন্যকে যাওয়ার রাস্তা দিতে হয় । একসাথে
২-৩ জন উঠানামা করা যায় না । ট্রেইনের সময়
সাথে করে খাওয়ার স্যালাইন, পানি ও ঘুরুজ নিয়ে
যেতে হয় । কোরাল, পাথর, বালি আর বাতাসে
আর্দ্ধতার জন্য প্রচুর ঘাম হয় । শরীর থেকে লবণ
বের হয়ে বক্সের চাপ করে যায় । আবরহাওয়া আর্দ্র
থাকলেও দুর্ঘটনার সভাবানা যেকে যায় । নিচে নামার
পথ অনেক খাড়া, পা একটু পিছলে গেলেই ঘটে
যেতে পারে বিপত্তি । মিনিট বিশেক পর প্রচণ্ড গরম
আর তাপে এক সময় মনে হয় শরীর থেকে বাষ্ঠির
মতো পানি ঝরবে । নিচে নামতে গিয়ে শরীরের

କୁଣ୍ଡି ଆର ଅବସାଦେ ଆତକ୍ଷିତ ହୟ । ଭାବି,
ଆବାରଣ୍ଡ ଏକଇ ପଥେ ଫିରବିଲେ ହବେ ।

ডাইনোসর বিচের সামনের তিনি দিকের





সৌন্দর্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। নীল স্বচ্ছ পানিতে জোয়ারের সময় সিঙ্কেট পথটি ডুবে যায়। পানিতে ভরে যায় ডাইনোসরের নিচের দুকেরে গোপন সূড়ঙ্গটি। তৃষিত মুক্ষ নয়নে চারপাশের সবুজ আর নীলের জলরাশি দোর্খ। একই সাথে দেখছিলাম প্রকৃতি আর ওপরের নীল আকাশকে। প্রচণ্ড তাপদাহে আর বাকবাকে বোদে ক্যামেরায় কিছুই দেখতে পাইনি। পানিতে হেঁটে হেঁটে কিছু দূর গিয়ে একদম সামনে থেকে সাগরের টেউয়ের খেলা দেখে প্রস্তুতি নিছিলাম ফেরার জন্য। আমাদের হাতে সময় সীমিত, সেল ফোনে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। মনে মনে অনুভব করছিলাম নুসা লেওনগানে থাকা অমগসঙ্গীরা আমাদের জন্য দুশ্শত্যায় আছে। তাছাড় কুটায় ফেরার আমাদের ফাস্ট বোট হেঁড়ে যাবে বিকাল সাড়ে ৪টায়। ঘড়িতে যখন বেলা সাড়ে ১১টা তখন আর দেরি না করে সিঙ্কেট বিচ থেকে মই ধরে উপরে উঠতে শুর করি। ডাইনোসরের মাথায় উঠে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর মধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীত দিকে ঠেলে এগোতে থাকি গন্তব্যে। অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীরে কোনো শক্তি নেই যেন অবশিষ্ট নেই। মুখের ভেতরে একটা কাঁচ আমের ললিপপ পুরে রেখেছিলাম যেন গলা শুকিয়ে না যায়। তবুও অতিরিক্ত ঘামে আর গরমে গলা শুকিয়ে যেন কাঠ। আবার পথ চলতে শুর করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই

ডাইনোসর সিঙ্কেট বিচের নীলাভ-সবুজ পানি আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়। এই পথ পারি দিতে আমাদের ৪০ মিনিট সময় লাগে। বিচে নামার এককম শেষ পর্যায়ে পর্যটকদের সুবিধার জন্য একটা মই লাগানো আছে, সেই মই বেয়ে আমরা কেলিংকিং সিঙ্কেট বিচে পা রাখি।

বিচের এক পাশে কয়েকটা গাছ রয়েছে। অনেক পর্যটক সেখানে বেস বিশ্রাম নেন। তেমন মানুষ নেই, সবেমোট ১২-১৫ জন হবে। ছায়াঘেরা গাছের এক পাশে কিছু স্থানীয় মানুষ কোমল পানীয় ও পাহাড়ি ফলের পসরা সাজিয়ে বেস আছে। আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। ছায়াঘেরা গাছের নিচে মিনিট দশকে বিশ্রাম নিলাম। চারপাশের মনোরম পরিবেশের সৌন্দর্য ভায়ায় বর্ণনাতৈত। দুপুর ঘিরে বিশাল উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাঢ়পালা আর নীল আকাশ আর নীলাভ সমুদ্রের জলরাশির মিলেমিশে একাকার। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর গেল। দুপুর প্রায় ১২টা, বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। আমাদেরকে যেতে হবে, নুসা পেনিন্ডা থেকে লেওনগানে। অন্যথায় বালিতে ফিরে যাওয়ার ফাস্ট বোট আমাদের রেখেই চলে যাবে সানুরে। আর দেরি না করে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যাই। এবার আমাদেরকে অভিকর্ষ বল ভেদ করে উপরের দিকে বেয়ে উঠতে হবে। হাতের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে



উপরে উঠতে লাগলাম। উঁচু-নিচু সিডি, প্রায় ৪০ মিনিট পাহাড়ি পথ বেয়ে গন্তব্যের থায় ৯০ শতাংশ অতিক্রম করার পরই ঘটলো বিপত্তি। অতিরিক্ত ঘামে রঞ্জচাপ কমে যাওয়ায় চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। সিডির একপাশে বসে জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাতাস থেকে অঙ্গীজন নিই। সুরের কথা মতো যাথা কিছুক্ষণ নিচে দিকে ঝুকে অপেক্ষা করছিলাম।

ক্রমেই দৃষ্টিসীমা বাপসা থেকে স্পষ্ট হয়ে আসে। আবারো পথ চলতে শুর করে ১০ মিনিটের মধ্যে উপরের উঠে আসি। লবণের অভাব পূরণের জন্যে ডাউস সাইজের দুটো ডাব খেয়ে নিলাম। বরফ ঠান্ডা পানিতে হাত-মুখ ধূয়ে রেঞ্জোরাঁ থেকে হালকা কিছু খেয়ে নিই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। রেঞ্জোরাঁর পাশেই ছিল একটা কালো জামের গাছ।

হাতের নাগাল থেকে কয়েকটা জাম পেড়ে মুখে দিতেই মিষ্ঠি স্বাদের রসে মুখ ভরে যায়। রেঞ্জোরাঁয় কথা বলে আরও কিছু জাম পেড়ে নিই নুসা লেওনগানে থাকা আমাদের ভোর আর সফরসঙ্গীদের জন্য। ক্যালিরি বাড়ানোর জন্য পথে মধ্যে আবারো একটি রেঞ্জোরাঁ নাসি গোরেং আর কিনে সাটো দিয়ে আগে ভাগেই মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিই একটু আগে ভাগেই।

লেখক: গবেষক ও পরিবেশবিদ ◆

ইন্দোনেশিয়ার ভিসা তথ্য

বাংলাদেশের পাসপোর্ট দিয়ে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ভিসা ছাড়াই অমগ করা যায়। আর এর মধ্যে একটি দেশ হলো- দ্বীপ রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। সত্ত্বত ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশিরা ইন্দোনেশিয়ায় ভিসা ছাড়া অমগের সুবিধাটি ভোগ করে আসছেন।

ফলে বাংলাদেশির ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের জন্য আগে থেকে ভিসা নিতে হয় না। ইন্দোনেশিয়া অবগে বাংলাদেশির ভিসা লাগে না। ভিসা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের সুযোগ নিতে হলে পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ছয় মাস থাকতে হবে। ফিরতি টিকিট এক মাসের ভেতর হতে হবে। আর ভ্রমণকালীন সময়ের জন্যে সাথে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে। ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞেস করলে দেখাতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে বলে রাখা ভালো। ইন্দোনেশিয়ায় ভ্রমণে গিয়ে কাজ করার বা সেখানে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এক মাস থাকার পরে সেখানে থাকার মেয়াদ বাড়ানোর কোনো সুযোগ নাই।

ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ দুতাবাসের ঠিকানা জেএল। জয়া মানদালা রায়া নং, ৯৩ মেনটেং দালাম, তেরেট, জাকার্তা সেলতান-১২৭৮০ টেলিফোন: +৬২ ২২১ ২২৮ ৩৫ ৮৭৬ এবং +৬২ ২২৮ ৮৮৭০ ০৫২২
ইমেইল-mission.jakarta@mofa.gov.bd



হিমালয়ের ঐতিহ্য

■ এলিজা বিনতে এলাহী

আমি পর্বতারোহী নই, সমতলের পর্যটক। খুব সীমিতজন যারা আমার কাজ সম্পর্কে জানেন; তারা আমাকে ঐতিহ্য পর্যটক বা হেরিটেজ ট্রাভেলার হিসেবেই চেনেন বা কাজ করতে দেখেছেন। তাহলে হিমালয়ের পথে কেন হেঁটেছি আমি? এক জীবনে কত অভিজ্ঞতাই তো সঞ্চয় করতে ইচ্ছে হয়!

একজন নন-ট্রেকার হিসেবে এভারেস্টের পথে হাঁটার

অভিজ্ঞত ছিল আমার জীবনে দারকণ কিছু ঘটনার

মধ্যে অন্যতম।

গল্প শুরু করার আগে একটি বিষয় বলা দরকার।

অনেকের কাছে হিমালয় ও এভারেস্ট প্রায় সমার্থক।

অর্থ হচ্ছে- হিমালয়ের পথ ধরে যাওয়া মানেই

এভারেস্ট শিখরে পৌছানো বা সামিট করা। কিন্তু

হিমালয়ে যাওয়া অর্থই এভারেস্ট অভিযানে যাওয়া

নয় কিংবা সামিট নয়। হিমালয়ের বিস্তৃত পশ্চিম

পাকিস্তানের নাঙ্গা পর্বত থেকে শুরু করে ভারত,

নেপাল, ভুটান হয়ে পুবে চায়নার নামচা বারওয়া

অবধি।

হিমালয়ে রয়েছে হাজার হাজার শৃঙ্গ। এর মাঝে

পৃথিবীর সবথেকে উচু শৃঙ্গের নাম এভারেস্ট। এই সুবিশাল পর্বতমালার প্রায় প্রতিটিতে যেমন আরোহণ করার সুযোগ রয়েছে, তেমনি রয়েছে হেঁটে বেড়ানোর সুযোগ।

পাহাড় প্রেমীদের ভাষ্য বলতে গেলে হিমালয়ের নানা পথে আছে ট্রেকিং ও হাইকিং। আরোহণ করতে অবশ্যই বিশেষ ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন। ট্রেকিং করার জন্য বিশেষ কোনো ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন নেই, তবে শারীরিক সক্ষমতার সাথে সাথে মানসিক শক্তি খুব জরুরি।

ঐতিহ্য অনুরাগী পর্যটক আমি, তাই হিমালয়ের পথে পথেও খুঁজেছি পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্য। যদিও

এভারেস্ট ও এর আশপাশের পর্বতমালা অবশ্যই

প্রাকৃতিক ঐতিহ্য কিংবা প্রাকৃতিক পুরাকীর্তির অংশ।

অল্প যা কিছু ঐতিহ্য দেখেছি যা আমার দৃষ্টিতে

হেরিটেজ এবং অবশ্যই ত মানবসৃষ্ট। এভারেস্ট

বেস ক্যাম্প অবধি যাওয়া ও ফিরে আসা মিলে ১৪

দিন হেঁটে বেড়ানোর পথে কী কী ঐতিহ্য মনকে

চমকিত করেছে, সেইসব নিয়েই আজকের এই

অমগ্ন রচনা।

তেনজিং-হিলারি বিমানবন্দর

এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকে কি শুধুই প্রকৃতির বিশ্বয় রয়েছে! মানুষের তৈরি কিছুই নেই! একথা বলতে বোঝাচ্ছি- সেখানে কি হেরিটেজ নেই! নিশ্চয়ই রয়েছে। ট্রেক শুরুই হয় এক ঐতিহাসিক বিমানবন্দর থেকে। বিশ্বে এক দুর্লভ নজির সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিমানবন্দর তৈরির।

কাঠমান্ডু থেকে বেস ক্যাম্প অবধি ভ্রমণের ছোট ছোট নানা অনুষঙ্গ সবই আমার জন্য ছিল বিস্ময়। ১৪ জনের ছোট একটি এয়ারক্রাফটে করে পর্বতের মাঝে দিয়ে লুকালার তেনজিং-হিলারি বিমানবন্দরে অবতরণও একটি বিস্ময়। ছোট এয়ারক্রাফট, ছোট রানওয়ে, পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ এয়ারপোর্ট। এই প্রথম কোনো বিমানের কক্ষগুলি দেখেছি। ছোট একটি প্লাস্টিকের পর্দা ঝুলছিল বিমানের ক্যাটেনেদের বসার জায়গা আর যাত্রীদের মাঝে।

প্লাস্টিকের হওয়ার কারণে কক্ষগুলি অন্যান্যেই দেখা যাচ্ছিল। সামনে না জানি আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছে। আমি আসলে মনে মনে অপেক্ষা করে



ছিলাম কখন এয়ারপোর্টটা দেখবো!

লুকলা এয়ারপোর্ট সম্পর্কে একটু বলি- বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদজনক বিমানবন্দরের মধ্যে আছে নেপালের লুকলা বিমানবন্দর। বর্তমানে এই বিমানবন্দরের নাম তেনজিং-হিলারি এয়ারপোর্ট। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিস্টি টিভি চ্যানেলে এই বিমানবন্দরকে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিমানবন্দর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৬৪ সালে নিউজিল্যান্ডের পর্বতারোহী স্যার এডমন্ড হিলারির তত্ত্বাবধানে এই বিমানবন্দর নির্মিত হয়েছিল। নিম্নাংকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালে স্যার এডমন্ড হিলারি এবং শেরপা তেনজিং নোরগের নামানসারে এই বিমানবন্দরের নতুন নাম রাখা হয় তেনজিং-হিলারি বিমানবন্দর। আকাশপথে কাঠমান্ডু থেকে মাত্র ৪০ মিনিটের দূরত্ব এই বিমানবন্দরের। বিপদজনক হলেও বিমানবন্দরটি বেশ জনপ্রিয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে লুকলা থেকে অধিকাংশ পর্বতারোহী মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে যায়। ২০১১ সালের আগে এই বিমানবন্দরের

রানওয়ে মাটির তৈরি ছিল।

লুকলা বিমানবন্দরের নাম তেনজিং-হিলারি হওয়ার কারণ নিচ্যাই স্বার জানা। ১৯৫৩ সালে এই দুইজন ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন এভারেস্ট জয় করে। লুকলা বিমানবন্দরে অবতরণ এবং আরোহণের জন্য বরাদ্দকৃত যে স্থানটি রয়েছে তা আকারে অনেক ছোট। পিচের আঞ্চলের রানওয়ের এই বিমানবন্দরে শুধুমাত্র হেলিকপ্টার এবং অন্যান্য ছোট বিমান অবতরণ করতে পারে। এর রানওয়ে ১,৭২৯ ফুট। লুকলা বিমানবন্দরের উচ্চতা ৯,৩০৮ ফুট। স্বল্প রানওয়ে এবং ভুক্তের কারণে এখানে বড় বিমান অবতরণ সম্ভব নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৪৩৮ মিটার ওপরে অবস্থিত এই বিমানবন্দর নেই কোনো উন্নত ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম।

মানে ও কানে

'Eliza you are passing through a Kane'
কৃষ্ণ বললো। ওহ! বলা হয়নি, এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে আমার গাইডের নাম কৃষ্ণ। আর পোর্টারের

নাম খুদ। পোর্টাররা ট্রেকারদের ব্যাগ বহন করে এক গন্তব্য থেকে অন্য গন্তব্যে নিয়ে যায়। অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রেকার নিজেই নিজের প্রায় ১০/১২ কেজি ওজনের ব্যাগ বহন করে থাকে। ফিরে আসি কানের গল্লে। 'এটির অর্থ কি কৃষ্ণ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কৃষ্ণ উত্তর- 'তুমি একটি নতুন গ্রামে প্রবেশ করছ পেছনে সব কুদৃষ্টিকে ফেলে'। একটি জনপদ থেকে অন্য একটি জনপদে প্রবেশ করার পেটকে বলা হয় কানে।

প্রতিটি গেটে ধর্মীয় কিছু বাক্য লেখা থাকে। প্রেয়ার ছাইলও দেখতে পেলাম। সবাই গেট পার হওয়ার সময় গ্রাথনা করে কানে গেট দিয়ে পার হয়। সব মন্দশক্তিকে অভিক্রম করে নিজ গন্তব্যে নিরাপদে পৌঁছার জন্য এই গেটগুলো বানানো হয়েছে।

নেপালের খুন্দু প্রদেশের বাসিন্দারা বহুকাল ধরেই এই সংস্কৃতি ধারণ করে আসছে।

'মানে' অর্থ টেন। লুকলা থেকে কিছু দূর ট্রেক করার পর পথের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পেলাম কিছু পাথরে খোদাই করে লেখা রয়েছে। শুধু যে পাথরে রয়েছে এমনটি নয়, ছোট ছোট পাথরের প্লেট বানিয়ে সেগুলো সুন্দর করে পথের মাঝে কিংবা এক কোণে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ট্রেকে চলতে চলতে কৃষ্ণাই আমার জন্য গুগল আংকেনের কাজ করছিল। ভীষণ অভিভূত আর আপ্লিত হয়েছি মানে-টেনগুলো দেখে। পাথরগুলোতে মূলত ধর্মীয় অনুশাসন, মন্ত্র, কথা, উপকথা লেখা রয়েছে। সবগুলোই তিক্তবৰ্তী ভাষায়। বহু যুগ যুগ ধরে এগুলো সংরক্ষিত আছে গোটা খুন্দু ভ্যালিজুড়ে।

টুকলা পাস সমাধি ভূমি

পর্বতেও সমাধি ভূমি। আমি ও অবাক হয়েছি। যারা আমার অমগ বিষয়ে জানেন বা অমগের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো দেখেছেন, তারা প্রত্যেকেই জানেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাধি ভূমির প্রতি আমার দারুণ দুর্বলতা আছে। সমাধি ভূমিকে আমার ইতিহাসের আড়ত মনে হয়।

টুকলা পাসের এই জায়গাটিকে ঠিক সমাধি ভূমি বলা যাবে না। এটি আসলে একটি স্মৃতিকেন্দ্র। এভারেস্ট ও অন্যান্য পর্বত আরোহণ করতে গিয়ে যারা আর ফিরে আসেননি তাদের উদ্দেশেই এই স্মৃতিকেন্দ্র বা স্মৃতিফলকগুলো রাখা হয়েছে। কারণ যারা হিমালয়ে দেহত্যাগ করেছেন তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেরপারা নিহতদের সম্মানার্থে একটি টুয়ের মতো বানিয়েছেন পাথর জড়ে করে। তারপর স্থানে ছোট একটি এপিটাফে নাম, বয়স, মৃত্যুকাল ও দেশ লিখে রাখা হয়েছে। পর্বতারোহীদের মেমোরিয়ালের স্থানে বাংলাদেশি সঙ্গল খালেদেরও স্মৃতিফলক রয়েছে। সেটি দেখে খুব গর্ববোধ হচ্ছিল। সঙ্গল খালে এভারেস্টে ও ঢুড় ছুঁয়েছিলেন, কিন্তু মেমো আসার সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরও একটি মেমোরিয়াল দেখেছি ট্যাংবোচে গ্রামে, আমার লজের পাশেই ছিল ৫/৬টি মেমোরিয়াল।

প্রস্তর স্তুপ বা পাথরের পিরামিড

ধীরে ধীরে হেঁটে উচ্চতায় উঠছি, সবুজ করে যাচ্ছে, পাথরের আকার বড় হচ্ছে। যেদিকে তাকাই শুধু পাথর আর পাথর। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট বড় পাথর সাজিয়ে উঁচু স্তুপের মতো বানানো রয়েছে। কোনো কোনো ট্রেকার আবার জিরামোর সময় বসে পাথরের স্তুপ করে রেখে কেউ কেউ বানানো স্তুপের ওপর আরও কিছু পাথর জোড়া দিচ্ছেন। কৃষ্ণ বলছিল- এগুলো রট ফাইভার।

যখন ছিল না গুগল, ছিল না স্মার্ট ওয়াচ, জিপিএস তখন কি ট্রেকাররা ট্রেক করেননি কিংবা পাহাড় প্রেমীরা পর্বতে আরোহণ করেননি? অবশ্যই করেছেন। হেঁটেছেন অজানার পথে, হারিয়েছেন পথ। হারিয়ে খুঁজে পাওয়ার দোলাচলে অন্য পথিকের পথ সুগম করার এই পাথরের স্ফটগুলো তৈরি করতেন। পরের ট্রেকাররা এসে বুকতে পারতেন এখানে আগেও ট্রাভেলাররা এসেছেন। এই ঝুট ফাইন্ডারগুলোই বিভিন্ন পথের নির্দেশনা দিয়েছে। ইংরেজিতে এই পাথরের পিরামিডকে বলা হয় কেন্দ্র, বাংলা করলে হয় সীমানাশূন্যক প্রস্তর স্ফুর। স্ফুতিস্ত তৈরিতে ও পথ প্রদর্শক হিসেবে এই পাথরের স্ফটগুলো ব্যবহার হয়। হিমালয়ের পথে হাঁটতে গিয়ে কত ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়েছি! আমার কাছে হিমালয়ের হেরিটেজ এগুলোই।

ট্যাংবোচে বৌদ্ধ মঠ

ট্যাংবোচে মঠ (থ্যাংবোচে বা দাওয়া চোলিং গোম্পা) হলো পূর্ব নেপালের খুন্দু উপত্যকায় অবস্থিত একটি তিব্বতি বৌদ্ধ মঠ, ১২৬৬৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এবং এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকের পথে। এটি সমগ্র অঞ্চলের সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং বৃহত্তম মঠগুলোর মধ্যে একটি। এর অবস্থান দুধ কেশি এবং ইমজা খোলা নদীর সঙ্গমস্থলে একটি পাহাড়ে; যেখানে আমা দাবলাম পর্বতের অবস্থান একটি অত্যাশৰ্য পটভূমি তৈরি করেছে। ট্যাংবোচে মঠ অনেক প্রাচুরিক দুর্ঘাগের সুস্থান হয়েছে। নির্মাণকালের প্রথম বছর ১৯১৯ সালে এটি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়, বিত্তীয় দৃষ্টিতে ছিল ১৯৮৯ সালে এটি আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। পরে এই মনাস্ত্রিকে আবার তৈরি করা হয়। হিমালয়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে কতই না ঐতিহ্য দেখা হলো। এমন নয় শুধুমাত্র একটি মন্দিরের দেখা মিলবে বেস ক্যাম্প অবধি। ছোট ছোট এ রকম অনেক মঠ, স্তুপা, মন্দির চোখে পড়বে। এছাড়া প্রেয়ার ফ্ল্যাগ, প্রেয়ার ছাইল তো প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে।

হিমালয়ের নায়করা

হিমালয়ের গম্ভীর বলার সময় যদি শেরপাদের কথা না বলি, তাহলে ভীষণ অপরাধবোধে ভুগবো। শেরপা জাতি! হ্যাঁ, হিমালয়ের সত্যিকারের নায়ক তো তারাই! তিব্বত, নেপালের খুন্দু অঞ্চল ও ভারতের দার্জিলিং অঞ্চলে পরিভ্রমণ করা একটি জাতি। হিমালয় অভিযানের একদম শুরুর দিকে এই জাতি মালামাল পারাপারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছিল। এখন এভারেস্ট এবং হিমালয় অভিযানে শেরপারা একটি অপরিহার্য অংশ। আমার মতো অনেকেই হয়তো পর্বতের গাইডদের শেরপা আবেন। কিন্তু শেরপা একটি জাতি; যারা পর্বতে অন্যান্য গাইডের মতো কাজ করে। শেরপা অর্থ গাইড নয়। যাত্রাপথে দেখা হয়েছিল দুজন শেরপার সাথে। একজন ৭ বার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন, অন্যজন ১৭ বার। দুজনের খাবার হোটেলেই আমি দুপুরের খেয়েছি। দুজনেই সাধারণ, দারুণ অমায়িক। রেস্টুরেন্ট চালিয়ে জীবন ধারণ করেন। শেরপাদের নাম কোথাও শোনা যায় না। মেডেল, সফলতা তো যিনি উপরে উঠেছেন উনার ঝুলিতে গেছে!

যাইহোক, এ এক নিদারণ বাস্তবতা! তবে আমার চোখে এভারেস্টের রিয়েল হিসেবে শেরপারা আর সেখানে আরোহণ করতে গিয়ে যারা আর ফেরেননি তারা। তারা এভারেস্টকে অমর করেছেন। এই দুজন শেরপার সাথে যখন দেখা হয়েছে, নিজেকে খুব শুরু মনে হয়েছে। কি অল্প কাজে নিজেকে সফল ভাবতে

শুরু করেছিলাম। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক সম্পন্ন করা একজন ৪৬ বছর বয়স্ক নন-ট্রেকার নারীর স্বপ্নপূরণ, কোনো সফলতা নয়!

ট্রেকের দিনগুলো

আগেই বলেছি, আমার গাইডের নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আর আমি কাঠমান্ডু থেকে একই সাথে লুকলা এসেছি। লুকলাতে এসে যুক্ত হয়েছে আমার পোর্টার খুদ। মাঝ বাংলা ও ইংরেজি নয়, কৃষ্ণ ৪টি ভাষায় কথা বলতে পারে। নেপালের ইতিহাস, হিমালয়ের নানা বিষয়, এভারেস্ট, ট্রেকিং, ট্রেকিংয়ের সময় খাবার দাবার, নিয়ম মেনে চলা, বিশেষ করে খুদের সাথে আমার হাসি বিনিময় আর ইশ্বরা ইঙ্গিতে কথা ছাড়া সেরকম কোনো বাক্য বিনিময়

ডাফেল ব্যাগ নাড়াচাড়া করছে। আমি, কৃষ্ণ ও খুদ তিনজনেই রেডি। খুদ লম্বা লম্বা পায়ে পিঠে আমার ১৫ কেজি ওজনের ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গেল।

নিমিষেই সে আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল। হাঁটছি ধীর পায়ে, টুকটাক কথা হচ্ছে কৃষ্ণের সাথে। কৃষ্ণ ভালো বাংলা বোবে, ইংরেজিতেও বেশ পারবাশী। শুধু বাংলা ও ইংরেজি নয়, কৃষ্ণ ৪টি ভাষায় কথা বলতে পারে। নেপালের ইতিহাস, হিমালয়ের নানা বিষয়, এভারেস্ট, ট্রেকিং, ট্রেকিংয়ের সময় খাবার দাবার, নিয়ম মেনে চলা, বিশেষ করে প্রচুর পানি করা- সবকিছু সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দিল সে আমাকে।



হয়নি। খুদ আর আমার মাঝে দোভাসীর কাজ করতে কৃষ্ণ। লুকলা এয়ারপোর্টের সব তথ্য কৃষ্ণের কাছ থেকেই শোনা।

লুকলাতে নেমেই সকালের নাস্তা সেবে হাঁটার পালা শুরু, মানে আমার ট্রেকিংয়ের হাতেখেড়ি। খাবার হোটেলের সামনেই দেখতে পেলাম খুদ আমার

হাঁটতে হাঁটতে লোকালয় পার হচ্ছি। সেখানকার অধিবাসীদের সাথে মাঝে মাঝেই হাসি ও কুশল বিনিময় হচ্ছে। প্রথম দিন হেঁটেছিলাম ৯ কিলোমিটার। স্বল্প পরিসরে বেস ক্যাম্প অবধি প্রতিদিনের যাত্রার অভিজ্ঞতা পুঞ্জনপুঞ্জ বলা সম্ভব নয়। তারপরও যাত্রার কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାତରେ ଥାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଁଥେ ଫାକଦିଂ ନାମେ ଏକ ଜାୟଗାର । ବେଳା ଗଡ଼ିଯେ ଯାଞ୍ଚିଲ କିନ୍ତୁ ଆମାର କାଙ୍କିତ ଲଜେର ଦେଖା ପାଞ୍ଚିଲାମ ନା । ଶେଷ ବେଳାଯ ଶକ୍ତି ନିଃଶେଷ ହେଁ ଆସିଛି । କୁଣ୍ଡ ହାସତେ ହାସତେ ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଛି ‘Eliza, final legs are always difficult’ । ଶେଷ ଅବଧି ଏସେ ଥାମାମ ଲଜେ । ସେଇ ସମୟ ବାଇରେ ତାପମାତ୍ରା ଛିଲ ୨ ଡିଘି ସେଲସିଆସ । ବାତାଦେର ସେରକମ ତୀତାତା ନା ଥାକଳେ ସମତଳେ ଗରମ ଆବହାୟା ଥିଲେ ଯାଓୟାର ପର ବେଶ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଁଛି । ସ୍ଵଭାବଗତତାବେ ପରିକାର ପରିଚିନ୍ତାର କହା ମଧ୍ୟାରେ ଏଲୋ । ରେଣ୍ଟ ରମେ ଗେଲାମ, ଏକଟି ପାତ୍ରେ ପାନି ଦେଖିଲାମ ଆଧା ବରଫ । ବେସିନ, କମୋଡ କୋଥାଓ ପାନି ଆସିଛେ ନା । କୁଣ୍ଡର ଶରଣପତ୍ର ହଲାମ । କଥା ବଳେ ବୁବାଲାମ- ଓୟେଟ୍ ଟିପ୍ୟୁ ଆର ବରଫ ଗଲା ପାନି ଛାଡ଼ା ଉପାର୍ ନେଇ । ରାତେ ଥାବାର ଦେଓୟା ହଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟ ଦ୍ଵାରା । ନେପାଲି ଥାଲି ଭାତ, ଡାଲ, ପାପଡ଼, ସବଜି, ଶାକ ଆର ମୁଗିଗିର ତାରକାରି । ଥାବାର ପର ବିଛାନା । ବିଛାନାଯ ମନେ ହଲେ କେଉଁ ବରଫ ପାନି ଢେଲେ ରେଖେହେ । ପୋଶାକ ଯା ପଡେ ଛିଲାମ ଶୁଦ୍ଧ ଉପରେର ଜ୍ୟାକେଟଟା ଖୁଲେ ଘୁମାତେ ଗେଲାମ । ଶରୀର ଏତ କୁଣ୍ଡ ଥାକାର ପରଓ ଘୁମ ଆସିଛି ନା, କିନ୍ତୁ କେଟେ ଗେଲ କାଙ୍କିତ ସ୍ଵପ୍ନେର କାହାକାହି ଯାଓୟାର ଏକଟି ରାତ!

ଆହ! ଏଭାରେସ୍ଟ ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ!

ଏର ପରେର ଗନ୍ତୁବ୍ୟ ନାମଚେ ବାଜାର, ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଟ୍ରେକେର ସବ ଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ବାଜାର । କେଉଁ କେଉଁ ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଅବଧି ଯାନ ନା, ନାମଚେ ବାଜାର ଦେଖିଲେ ଏକଟି ପରିଚିନ୍ତା ହେଁବାକ କରେ । ନାମଚେ ବାଜାର ପ୍ରେବେଶ ମୁଖେର ପଥଟା ଦାରଗ । ସନ୍ଧ୍ୟ ହେଁବାକ କିଛି ଆଗେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଛାନେ ଏକଟି ଶହରେ ଏଲାମ । ନାମଚେ ବାଜାର ଏସେ ନତନ ଏକଟି ବିଷୟରେ ସାଥେ ପରିଚିତ ହେଁଛି ଏକିମାଟାଇଜେଶନ । ବେଶ ଉଚ୍ଚତାର ସାଥେ ଶରୀରକେ ଖାପ ଯାଓୟାନେର ଜନ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକଟି ଉଚ୍ଚତାଯ ଯାଓୟାର ପର ଆବାର ନେମେ କିଛିଟା କମ ଉଚ୍ଚତାଯ ଘୁମାନେର ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଏକିମାଟାଇଜେଶନ ବଲେ । ଏଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚତାର ସାଥେ ଶରୀରକେ ଖାପ ଯାଓୟାତେ ହେଁ । ନାମଚେ ବାଜାରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକିମାଟାଇଜେଶନ କରିବାରେ ହେଁ, ଅର୍ଥାତ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ହେଁବାକ କାରଣେ ପେଛନେ ରଯେହେ ସ୍ୟାର ହିଲାରି । ସବାଇ ବଳେନ- ହିଲାରି ଏଥାନେ କିଛିଦିନ ବସବାସ କରିଛେ ।

ପାଂଚ ତାରକା ହୋଟେଲଟିଓ ଏହି ନାମଚେ ବାଜାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ହୋଟେଲ ଏଭାରେସ୍ଟ ଭିଟ୍ । ନାମଚେ ବାଜାର ଏତ ଜନପ୍ରିୟ ହେଁବାକ କାରଣେ ପେଛନେ ରଯେହେ ସ୍ୟାର ହିଲାରି । ସବାଇ ବଳେନ- ହିଲାରି ଏଥାନେ କିଛିଦିନ ବସବାସ କରିଛେ । ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ପୌଛାନେ ଅବଧି ଦିନପଞ୍ଜିଟା ନାମଚେ ବାଜାରେ ପର ଏରକମ ଛିଲ- ନାମଚେ ବାଜାର ଥିଲେ ଟ୍ୟାଂବୋଚେ ଗନ୍ତ୍ୟ, ସେଖାନ ଥିଲେ ଦିନ୍ବୁଚେ- ଏଭାବେ ଟ୍ରେକ ଚଲିଲେ ଥାକଲେ । ଦିନ୍ବୁଚେତେ ଗିଯେ ଆବାର ଏକିମାଟାଇଜେଶନ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚତାଯ ଉଠିଛି ଆର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି । ଶାସଜନିତ କିଛିଟା ଅସ୍ପିତି, ହାଲକ ମାଥା ବ୍ୟଥା, ରାତେର ଘୁମେର ବ୍ୟଥାତ, ଥାବାରେ ତାନୀହ ନିଜେର ମାଝେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛିଲାମ । ତୀତି

ମାତ୍ରାଯ ଅନୁଭୂତ କରିଛିଲାମ ନା, କିନ୍ତୁ ନିଜେର ଭେତର ଟେର ପାଞ୍ଚିଲାମ । ଡିଂବୁଚେତେ ଏକିମାଟାଇଜେଶନେର ସମୟ ବିକାଳେ ବେଡାତେ ଗିଯେଛିଲାମ ୧୪ ହାଜାର ଫୁଟ ଏକଟି ବେକାରିତେ ନାମ ‘ଫ୍ରେପ ବେକାରି’ । ଏହି ପ୍ରଥମ ଏତ ଉ୍ଚୁତେ କୋନୋ ବେକାରିତେ ଏଲାମ । ଏର ପରେର ଗନ୍ତୁବ୍ୟ ଲୋବୁଚେ । ସ୍ଵପ୍ନେର ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଆର ବେଶ ଦୂରେ ନାୟ, ଏହି ଉତ୍ତେଜନାୟ ରାତେର ସୁମ ଆରାଓ କମିତେ ଲାଗିଲେ । ଉଚ୍ଚତା ବାଡାହେ, ତୁମାରପାତ ବାଡାହେ, ତାପମାତ୍ରା କମାହେ, ଉତ୍ତେଜନା ବାଡାହେ, ଆରାଓ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି । ସବ ମିଳିଯେ ଏଥିନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବସଲେ ଆସିଲେଇ ଏକଟି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଵପ୍ନେର ମତୋ ମନେ ହେଁ । ଲୋବୁଚେ ଥିଲେ ଗୋରକଶେପ ଯାଆଟା ବେଶ କଟକର ଲେଗେହେ । କାରଣ, ଗୋରକଶେପ ଥିଲେ ଏବେ ଆବାର ଗୋରକଶେପ ଫିରିବେ ହେଁ । କାରଣ, ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଥାକାର ଜାୟଗା ନେଇ । ସେଜନ୍ୟ ଏକଟି ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭୂତ କରିଛିଲାମ । ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାର ତାଗିଦ, ଅଭିଭୂତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୌଛାନେ ଆବାର ଏଦିକେ ପା ଯୁଗଳ ଜାନାନ ଦିଲ୍ଲିଲ ଯେ, ତାର ଖୁବ ଭାଲୋ ନେଇ । ବିଶାଳ ବିଶାଳ ପଥର ଆର ପ୍ଲେସିଆରେର (ହିମବାହ) ଉପର ଦିଲେ ହେଁଠେ ସଖନ ଏଭାରେସ୍ଟ ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଲେଖା ପାଥରଟାର ସାମନେ ଦାଢିଯେଇ, ବିଶାସ ହେଁଛି ନା । ଏଥିରେ ଲେଖାର ସମୟ ବିଶାସ ହେଁଛି ନା, ଆମ ଟ୍ରେକ ଶେଷ କରେ ଦେଶେ ଫିରିରିଛି ।

କେନ ହେଁଠେଛି ହିମାଲ୍ୟେ?

ଏଭାରେସ୍ଟ ଖୁବ ଦେଶେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଥାନକାର ସବ ପର୍ବତେର ନାମ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମର ସାଥେ ମିଳ ରେଖେ କରା । ତବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚଢାର ନାମ ଇଂରେଜି କେନ? କୃଷ୍ଣ ବଲଛି- ‘ତିବ୍ରତୀୟଦେର କାହେ ଏହି ଚଢା ଚେମୋଲିଂମା ନାମେ ପରିଚିତ, ନେପାଲେର ଶେରପାଦେର କାହେ ପାରିଚିତ ସାଗରମାଥା ନାମେ’ । ଦୁଟୋ ନାମ ଥାକାର ପର ଏଭାରେସ୍ଟ ଦେଶ୍ୟ ହେଁ । ପଶ୍ଚିମା ଆଗ୍ରାସନ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ- ଏଶ୍ୟାର ଦେଶଗୁଲେର ଯେଣ ମୁକ୍ତି ନେଇ । ଏଭାରେସ୍ଟ ଆମାର କାହେ ‘ସାଗରମାଥା’ ନାମେଇ ବେଶ ପ୍ରେମମ୍ୟ, ବେଶ ମାୟାମ୍ୟ । ଏହି ଟ୍ରେକ ଛିଲ ନିଜେର ସାଥେ ନିଜେର ଏକଟି ବୋକାପଡ଼ା । ଏକଟି ସ୍ଵପ୍ନପୂରନେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ଆମାଦେର ଦେଶେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥି ନାରୀର ରଯେହେନ, ଯାଦେର ଇଚ୍ଛା ଆହେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆହେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା କେଉଁ ଜାଗିଯେ ଦେୟନି କଥିଲେ । ଆମାର ମତୋ ଏକଜନ ୪୬ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ନନ- ଟ୍ରେକାର ନାରୀ ଯଦି ଏଭାରେସ୍ଟ ବେସ କ୍ୟାମ୍ପେର ଅଭିଭାବିତ ଅର୍ଜନ କରିବେ ପାରେ, ସେଇ ଅଭିଭାବିତ ନେଓୟାର ଯୋଗ୍ୟତା ସବାର ରଯେହେ ।

ଲେଖକ: ପର୍ଯ୍ୟକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ◆



মিয়ামি বিচে

■ প্রকৌশলী জেবি বড়ুয়া

যুক্তরাষ্ট্র একটি দেশ নয়, ৫২টি রাজ্য বা প্রদেশ নিয়ে যেন একটি মহাদেশ। এই ৫২টি রাজ্যের অনেকগুলোর আয়তন বাংলাদেশের চেয়ে, কোনো কোনোটি কয়েকগুণ। বিরাট দেশ বলে এক এক অঞ্চলের এক এক রূপ, বৈচিত্র্যেও অভাব নেই। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি, দেখেছি বহু শহর ও দর্শনীয় স্থান। কোনো কোনো নগর বন্দর মেঝে বিশেষ উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে বা কোনো বিশেষ পারিপার্শ্বিক কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আমার দেখা আমেরিকার অনেক শহর বা নগরের মধ্যে তিনটি শহরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার নজরে এসেছে। যেমন- আমার অভিজ্ঞতায় 'লাস ডেজাস'কে মনে হয়েছে জুয়াড়িদের শহর, 'হলিউড'কে পাগলের শহর (এত পাগল আমি আর কেওথাও দেখিনি), আর 'মিয়ামি বিচ'কে ন্যাংটা বা অর্ধ-ন্যাংটা মেয়েদের লীলাভূমি। তার মধ্যে আপনি যদি জুয়াড়ি দেখতে চান যানেন লাস ডেজাসে, পাগল দেখতে হলে হলিউডে আর ন্যাংটা বা অর্ধ-ন্যাংটা মেয়ে দেখতে মিয়ামি বিচে।

প্রশাসনিক বিভাজনে 'মিয়ামি' ও 'মিয়ামি বিচ' দুটি সম্পূর্ণ আলাদা শহর। মিয়ামি হচ্ছে মূল ভূখণ্ডে (Main Land) অবস্থিত বিশাল কসমোপলিটন নগর। আর আটলান্টিকের বুকে মূল ভূখণ্ডের কাছে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপকে নিয়ে মিয়ামি বিচ শহর, মূল ভূখণ্ডের সাথে সেতু দিয়ে সংযুক্ত। বিসকেইন উপসাগরের অবস্থিত মিয়ামি বিচ প্রধানত ট্যারিস্ট সমাগম এলাকা, মূলত অগণিত ট্যারিস্ট হোটেল ও অবসর কাটানোর অ্যাপার্টমেন্ট (Holiday or Retired Apartments) নিয়ে গঠিত। দ্বীপগুলোর উত্তর ও দক্ষিণে বড় বড় বিচ, উফ ট্রিপক্যাল আবহাওয়ার কারণে সারা বছর পর্যটক সমাগমে মুখর। এছাড়া মিয়ামি বিচেই রয়েছে 'পের্ট অব মায়ামি', যা পৃথিবীর 'ক্রুজ রাজধানী' হিসাবে খ্যাত। ২০০০ সালে আমেরিকা ভ্রমণে এসে তখন আমি ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের সর্ব-দক্ষিণে ফোর্ট লড়ারডেলে অবস্থান করছিলাম। মিয়ামি প্রবাসী আমার এক অধ্যাপক বন্ধু খবর পেয়ে সেটেইন্সের এক বিকালে আমাকে মিয়ামিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন। ফি ওয়ে ধরে গাড়ি চালিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফোর্ট লড়ারডেল থেকে মিয়ামিতে বন্ধুর বাসায় পৌছে যাই। তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। বন্ধুপত্নী সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তাদের বিয়ের আগের থেকে আমার সাথে মহিলার পরিচয় ছিল, খনিকটা বন্ধুত্ব ছিল।

অনেকদিন পর পুরোনো বন্ধু ও বান্ধবীর সাথে মিলিত হয়ে আমরা সবাই খুবই আনন্দিত হই। সকালে ব্রেকফাস্টের পর বন্ধুর তার কলেজে চলে গেলে আমার বন্ধুপত্নী বা আমার প্রাক্তন বান্ধবী আমাকে নিয়ে বের হন। একটি ট্যাঙ্কিতে করে আমরা সাউথ বিচে আসি। আটলান্টিকের পাড়ে এই সেই আমেরিকার বিখ্যাত মিয়ামি বিচ, যার কত গালগঞ্চ শুনেছি। কিন্তু প্রথম দর্শনে খুব হাতাশ হলাম। স্বদেশে বিদেশে ভারত মহাসাগর (বঙ্গোপসাগরসহ), প্যাসিফিক ও আটলান্টিকের পাড়ে বহু বিচ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মধ্যে যে কয়টি নিকৃষ্টতর বিচ দেখেছি, এটি তার

করছেন। তাদের গায়ে স্বল্পবাস ম্যানের পোশাক, মেয়েরা বিকিনি পরা, ছেলেরা বক্সার পরা। অল্প এগোতে দেখি, কয়েকটি মেয়ে টপলেস হয়ে বালুকা তটে চাদর বিছিয়ে রোদ্রিগান করছে। গোপন অঙ্গটি সামান্য ফিতার মতো কিছু দিয়ে ঢাকা। পাশ থেকে দেখেলে মনে হয় কিছুই নেই। হাঁটতে হাঁটতে দেখি এরকম আরও অনেক। এক জায়গায় আমাদের সামনেই তিনি/চারটি মেয়ে টপলেস হয়ে জল থেকে উঠে আসছে। কাছ থেকে তাদের উদ্বিগ্ন স্তনাশ চূড়া থেকে জলের ফেঁটা গড়িয়ে পড়ছে, যেমন শীতের ভোরে কচুপাতা থেকে শিশিরবিন্দু গড়িয়ে পড়ে। আমি দাঁড়িয়ে ঘাবার মতো তাকিয়ে দেখতে থাকি মেয়েগুলোর নিরাভরণ দেহবল্লৰী আঁকবাঁক ও খাঁচখোঁচ। বন্ধুপত্নী বললেন- আরে আমন অসভ্যের মতো তাকিয়ে আছেন কেন? বললাম- আমি অসভ্য মানুষটা এসব সভ্য নারীদের অনাবৃত দেহের অপূর্ব সৌষ্ঠুক দেখার লোভ সামলাতে পারিছি না। তাদের অঙ্গ নড়াচড়ার সময় উন্মুক্ত উদ্বিগ্ন স্তন যুগলের আন্দোলন আর নিতারের হিঙ্গেলকে মনে হচ্ছিল, যেন এক একটি চলমান ছন্দময় করিত। বন্ধুপত্নীকে ঠাট্টা করে বললাম- 'চলুন আমরাও কাপড় খুলে নেমে পড়ি'। উত্তরে বললেন- 'আপনার সাথে সমুদ্রে নাইতে নামার এই প্রস্তাবের চেয়ে, এই মুহূর্তে আমার কাছে আনন্দময় আর কিছু নেই। আপনার বন্ধু বড় বেরসিক মানুষ, এসবে কোনো উৎসাহ নেই।' আমি সাগরজলে নামার জন্য তৈরি হয়ে আসিন। আর এদিকে বন্ধুপত্নী সত্যি সত্যি তার পরনের জামা- প্যান্ট খুলতে শুরু করেন। আমি অনেক কঁকড়ে তাকে নিবৃত্ত করি। আমি আপনি না করলে তিনিও টপলেস হতেন কিনা জানি না। যাহোক, আমি তার সুড়োল উরুব্রয় ও স্তন যুগলকে সুর্যালোকে উঘোচিত হতে দিনি।

লাখের আগে আমরা বাসায় ফিরে যাই। লাখের পর কিছুক্ষণ বিশাম করে বিকালে আমি একা বের হয়ে মেইন ল্যান্ডের জাহাজ বা লঞ্চ ঘাটে আসি। মিয়ামির একমাত্র আকর্ষণ কিন্তু সমুদ্রজলে বা রোদ্রিগান রত্ন বা অর্ধনগ্ন নারীদের অনাবৃত দেহবল্লৰী দর্শন নয়। এখানে আছে দেখার আরও অনেক মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিক্ষণ ও উপভোগের নানা আয়োজন। তার মধ্যে একটি অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ বিসকেইন উপসাগরে 'ক্রুজ ভ্রমণ'। ক্রুজ ভ্রমণে দুটো ব্যঙ্গলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মিয়ামি ডাউন টাউনের দর্শনায়ি আকাশচুম্বি স্কাইলাইন, মিয়ামি বন্দর, ফিশার দ্বীপ, মিয়ামি সৈকত ও আমেরিকার মিলিওনিয়ারদের ঘরবাড়ি। ডাউন টাউনের লঞ্চঘাটেই বিসকেইন উপসাগরে 'ক্রুজ ভ্রমণ' পরিচালনাকারী বেশ কয়েকটি সংস্থার অফিস আছে। আমি একটি সংস্থা থেকে দেড় ঘণ্টার প্রমোদভ্রমণের টিকিট কাটি। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ক্রুজ শিপ বা লঞ্চটির নাম 'আইল্যান্ড লেডি'। জেটি থেকে



প্রমোদতরীটি ছাড়ে। আমরা দশ/বারো জন যাত্রী। মিনিটা বেশ গরমের। দেখি আমি ছাড়া সবার মাথায় সানহাট, চোখে সানগ্লাস ও মুখে সানস্কিন মাখা। জেটি ছেড়ে লঞ্চ এগোতে থাকলে পেছনে মিয়ামি ডাউন টাউনের দৃষ্টিন্দন ক্ষাইলাইন দৃশ্যমান হয়। আকাশচৰ্ষী এক একটি অটোলিকার স্থাপত্য অনবদ্য। উঠে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে শিয়ে ঢেউয়ের ধাকায় প্রমোদতরীর আন্দোলনে তাল সামলাতে না পেরে পাশে বসা তরুণী সহযাত্রীর কোলের ওপর পড়ি! আমার একটি হাত তার দুই নরম উরুর সঞ্চিহ্নলে পড়ে। ভাবলাম, বি জানি বলে। না, সে কেননো রকম রাগ না দেখিয়ে বেরং একটু হেসে আমাকে ধরে উঠে বসতে সাহায্য করে। তার উন্মুক্ত সুটোল বাহলতার স্পর্শ ও তার দেহের সুবাস আমার ঘায়ুতে শিহরণ জাগায়। পরবর্তী সময় আরও ছবি তোলার সময় বার বার ভেবেছি- বেতাল হয়ে আবার কেন পড়ে যাই না। ভাবি, একবার ইচ্ছে করে অভিনয় করেই পড়ে যাব নাকি। সাহস হলো না। কেননা, যদি বুবুতে পারে তাহলে চ্যাংডেলা করে আমাকে বিসেকেইন উপসাগরে ছুঁড়ে ফেলবে!

আমাদের তরী এগিয়ে যায় তটরেখা থেকে বেশ দূর দিয়ে পোর্ট অব মিয়ামি'র দিকে। দেখি লাইন দিয়ে দাঁড়ানো মিয়ামি ডাউন টাউনের ক্ষাইলাইন বিশাল বিশাল অপূর্ব সুন্দর অনেক ক্রুজ শিপ। এখান থেকে অমাগাথীদের নিয়ে বিশেষ বিভিন্ন স্থানে পাড়ি দেয় বিলাসবহুল এসব বিশাল প্রমোদতরী। দূর থেকে প্রমোদতরীগুলোর বিশালত্ব ও জাঁকজমক আবাক হয়ে দেখি। তারপর আমাদের তরী ঘুরে দ্বিপ্রের আরেক দিকে চলে আসে। এখানে তটরেখার ধারে ধারে অনুপম দর্শনীয় সব অটোলিকর সাবি। এক এক খঙ্গ বিশাল জায়গার ওপর এক একটি বাড়ি নির্মিত।

বাড়িগুলোর স্থাপত্য এবং প্রত্যেকটির বাড়ির চারদিকে গড়ে তোলা বাগান ও ল্যান্ডস্কেপের বিন্যাস অতুলনীয়। গাইড জানালো, এই বাড়িগুলোর মালিক আমেরিকার সব ধনাট্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির।

শীতকালে উত্তরের অন্যান্য রাজ্যগুলো যখন বরফে ঢাকা পড়ে তখন বা অন্য সময়ে বিশেষ অবসর কাটাতে ওইসব অঞ্চলের বড়লোকেরা এখানকার বাড়ি বা আয়াপার্টমেন্টে এসে থাকেন। এই বাড়িগুলোর সারিকে বলা হয় 'মিলিওনিয়ার্স রো'। আমাদের তরী তৈরি ঘেঁষে আস্তে আস্তে চলতে থাকে। আবাক বিশ্বায়ে দেখতে থাকি বৃগৃদ্ধ বাড়িগুলোর জোলুস, দৃষ্টিন্দন স্থাপত্য ও অনুপম বিন্যাস। এরপর প্রমোদতরীটি ফিশার আইল্যান্ড ও সাউথ বিচের বরাবর ঘুরে যায়। যেদিকে তাকাই সেদিকে মন ভোলানো আর চোখজুড়নো দৃশ্য। খুব তাড়াতাড়ি যেন দেড় ঘণ্টা সময় শেষ হয়ে এলো।

ধীর লয়ে আমাদের তরী আবার জেটিতে এসে ভিড়ে। আমরা তৌরে উঠে আসি। এই অনবদ্য রোমাঞ্চকর ক্রুজ শিপের সাবি ভ্রমণে দেখা মিয়ামি বিচের মনোমুক্তকর দৃশ্যগুলোর কথা অবিশ্রণীয় হয়ে থাকবে।

পরদিন সাঙ্গাহিক ছুটি। বন্ধুবরের কলেজ নেই।

তিনি সকালে তার গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে বের হন, মিয়ামি বিচের আর এক বিশেষ দ্রষ্টব্য দেখানোর জন্য। এটি হলো মিয়ামি সিকুরিয়াম' (Miami Seaquarium)। সিকুরিয়ামে জনপ্রতি প্রবেশমূল্য খুব বেশি মনে হলো। অ্যাকুরিয়ামে সমুদ্রতেলের লেবেলে নানা সামুদ্রিক প্রাণীর সমাহার। এই অ্যাকুরিয়ামের আসল দ্রষ্টব্য জাঁকালো সামুদ্রিক প্রাণী ডলফিনের প্রাণ-মাতানো খেলা। নিচের অ্যাকুরিয়াম দেখে আমরা আসি স্টেডিয়াম আকারের এক বিরাট ওয়াটার পুলে। দুদিকে দর্শকদের বসার গ্যালারি। আমরা গ্যালারিতে উঠে দর্শক শারিতে গিয়ে বসি। শুরু হয় ডলফিনের মনোমুক্তকর খেলা। পুলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভেসে বেড়ানো, মাঝে জল থেকে মাথা তুলে দর্শকদের উদ্দেশে অবোধ্য ভাষায় কিছ বলা এবং নানা রকম অ্যাক্রোব্যাট। এরপর চলে সংগীতের মুর্ছনার তালে তালে পুলের জলে ডলফিনের একক ন্ত্য, যুগল ন্ত্য ও দলীয় ন্ত্য। তারপর দেখি দুটি বাচ্চা হেলেমেরো একটি অনুচ্ছ মঞ্চে এসে দাঁড়ালে দুটি ডলফিন ও ওই মঞ্চে উঠে আসে এবং তাদের সাথে খেলায় মন্ত হয়। তারপর বাচ্চা দুটি ডলফিন দুটির পিঠে চাঢ়ে জলে ভাসে।

তারা ডলফিনের সাথে হটেপুটিতে মাতে এবং নানা অ্যাক্রোব্যাটে অংশ নেয়। আমরা আরও অনেক দর্শকের সাথে ডলফিনের এই অনবদ্য লীলা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে থাকি। এক সময় অনুষ্ঠান শেষ হলে দর্শনের করতালিতে মুখর হয় সমগ্র পুল।

এখানে দর্শকদেরও ডলফিনের সাথে খেলায় অংশ নেয়ার ব্যবস্থা আছে। এ জন্য আলাদা টিকিট লাগে। দারণ এক অভিভূত নিয়ে পুল থেকে বের হয়ে আসি। বন্ধুবরকে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি দ্রষ্টব্যস্থানে নিয়ে আসার জন্য। দুপুর দেড়টায় আমরা বাসায় ফিরে আসি।

লেখক: গবেষক ও পরিব্রাজক (অব. সরকারি কর্মকর্তা) ◆





আমেরিকার কয়েকটি বর্ণিল মুহূর্ত

কল্প
গত
গ্রন্থ

■ মোকারম হোসেন

সকালে হৃদস্ত হয়ে এসে দেখি ওয়াশিংটন ডিসির রোমান্টিক রিগ্যান সেন্টারের পূর্ব নির্ধারিত কর্মশালা শুরু হয়ে গেছে। মাঝারি আকারের হলরুমে উপস্থিতি নেহায়েত মন্দ না। কয়েকজন মিডিয়া কর্মীও আছেন। অভ্যর্থনা কক্ষে ব্যাগপত্র জমা রেখে আইডি কার্ড সঞ্চাহ করে নিলাম। বাংলাদেশ লেখা প্ল্যাকার্ডের নিচেই মিলল আনুষঙ্গিক কাগজপত্র। সবকিছু নিয়ে বসলাম পেছনের সারিতে। পিনপতন নিরবতার মধ্যেই চলছিল আলোচনা। দেরিতে আসায় আলোচকের নামটা জানতে পারিনি। তবে পরিবেশ, প্রযুক্তি ও কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নিয়ে চমৎকার বলছিলেন। এবং এই তিনটি বিষয়ের আন্তঃসংযোগগুলোও দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এরপর চা-বিরতি। শুধু চা বলাটা মনে হয় ভুল হবে। কারণ চায়ের সঙ্গে টা'র আয়োজনটাও জনপ্রিয়। সবাই ছোটে ছোটে দলে বিভক্ত হয়ে তুমল গঞ্জে মেতে উঠল। অথচ আমি কাউকেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অগত্যা তথ্যকেন্দ্রের সহযোগিতা চাইলাম। ওরা খুঁজে বের করল জাপান থেকে আসা লুকাস লিমকে। প্রথম পরিচয়েই মনে হলো লুকাস দারুণ প্রাণবন্ধ। বয়স ত্রিশ পঁয়াজিশের বেশি নয়। অনেক বেশি এনার্জেটিক এবং হাসিখুশি। বাকি সেশনগুলো লুকাসের সঙ্গেই বসলাম। কয়েকটি দেশের মন্ত্রীগণও এসেছেন এই কর্মশালায়। একেবারে দুপুর গড়িয়ে দুপুরের খাবার শেষ হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মিশরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচয় হলো। লুকাস হলেন এই যোগাযোগের মূল অনুষ্ঠটক। বিকালে মধ্যেই আসুন ভাঙল। আমরা পাঁচজন জড়ে হলাম এক কোণায়। তারপর বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। লুকাস আমাদের অধোযোগিত দলপত্র বনে গেল। কারণ এখানে সে আরেকবার এসেছিল, সেই সুবাদে পথঘাট ভালোই চেনে। ওয়াশিংটন ডিসি

এসে হোয়াইট হাউস দেখব না তাতো হয় না! সুতরাং সবকিছুর আগে হোয়াইট হাউস। আমরা যখন গিয়েছি তখন ভিজিটিং আওয়ার চলছিল। মানে সীমানা প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যাবে। এই সুযোগটা সবাই কাজে লাগালো। একপ ছবি, একক ছবি আবার বিখ্যাত সাদা বাড়িটির ছবি; রাশি রাশি ছবি তুলল সবাই। ছবি তোলা শেষ হলে আমরা একটা ছেউ পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকি। বেশ সাজানো গোছানো পার্ক। ম্যাগনোলিয়ার অনেকগুলো গাছ, বেশ বড়সড়। আমাদের দেশে ম্যাগনোলিয়ার এত বড়ে গাছ দেখা যায় না। তবে ভিন্ন প্রজাতিও হতে পারে। গাছে কোনো ফুল নেই, শুধু কতগুলো শুকনো ফল ঝুলে আছে। লুকাসকে বললাম আমার একটা সিমকার্ড কিনতে হবে। কোথাও যোগাযোগ করতে পারছি না। আজকাল মোবাইল ফোন ছাড়া অন্ধের পথচলার মতো অবস্থা। লুকাস বলল এ আর এমন কি, চলো কিনে দিচ্ছি। আমরা গোলাম 'T' মোবাইলের একটি বিক্রয় কেন্দ্রে। আইডি হিসেবে আমার পাসপোর্ট দেখিয়ে এক বছর মেয়াদী একটি সিমকার্ড কেনা হলো। পরে বুরোছি অঞ্জিদ্য ভয়ঙ্কর! লুকাস স্বল্পজ্ঞানে আমাকে যে সিমকার্ডটি কিনে দিয়েছিল তা ছিল শাখের করাত। ফোন আসলেও বিল কাটে, গেলেও কাটে! কেউ ফোন করে যদি লঘু কথা শুরু করে তাহলে আর রক্ষা নেই। অথচ কাউকে মুখ ফুটে বলতেও পারি না এই দানবীয় সিমকার্ডের কথা। সব কিছু নিরবেই হজম করতে হলো!

যাহোক, আমরা আরও কিছুক্ষণ ঘূরে ফিরে স্টারবাকসের একটি কফি সোপে ঢুকলাম। আমেরিকার বিখ্যাত ব্র্যান্ড স্টারবাকস কফি। আমাদের প্রচুর এনার্জি দরকার। হিসাব মতো বাংলাদেশে তখন রাত। অন্যান্য এশীয়দেরও প্রায় একই রকম সময়। আমাদের সবাইকে ঘূম তাড়া করে ফিরছে। চারপাশে কফির তীব্র পোড়ায়াণ

ওয়াশিংটন ডিসি এসে হোয়াইট হাউস দেখব না তাতো হয় না! সুতরাং সবকিছুর আগে হোয়াইট হাউস। আমরা যখন গিয়েছি তখন ভিজিটিং আওয়ার চলছিল। মানে সীমানা প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যাবে। এই সুযোগটা সবাই কাজে লাগালো। একপ ছবি, একক ছবি আবার বিখ্যাত সাদা বাড়িটির ছবি; রাশি রাশি ছবি তুলল সবাই। ছবি তোলা শেষ হলে আমরা একটা ছেউ পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকি। বেশ সাজানো গোছানো পার্ক। ম্যাগনোলিয়ার অনেকগুলো গাছ, বেশ বড়সড়। আমাদের দেশে ম্যাগনোলিয়ার এত বড়ে গাছ দেখা যায় না। তবে ভিন্ন প্রজাতিও হতে পারে। গাছে কোনো ফুল নেই, শুধু কতগুলো শুকনো ফল ঝুলে আছে।

ভেসে বেড়াচ্ছে। কফি কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাদের চাঞ্চ করে দিল। সন্ধ্যার দিকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমাকে যেতে হবে অনেক দূর। প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ছেউ শহর সেন হোজেতে। একটা ট্যাঙ্ক নিয়ে এয়ারপোর্ট চলে গেলাম। ওয়াশিংটন ডিসির অভ্যন্তরীণ বহির্গমনে গিয়ে প্রথম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ধাক্কাটা খেলাম। যার যার বোর্ডিং পাস স্বয়ংক্রিয় মেশিন থেকে নিজেকেই করে নিতে

কলোরাডো রাজ্যের ডেনভার শহরে ছোট একটা ট্রানজিট মিতে হবে। ডেনভার থেকে যে এয়ারবাসে উঠলাম সেটি একেবারেই ছোটো। আকাশ পথের প্রায় সারারাত নিঘুম কাটল। সেন হোজে সৌচাতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। ব্যাগেজপত্র বুরে নিয়ে একটি ট্যাঙ্কি নিয়ে সরাসরি হোটেলে চলে গেলাম। হোটেলে আগেই বুকিং করা ছিল। সেন হোজে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বিখ্যাত একটি শহর। রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থানটা একেবারে প্রশংসন মহাসাগরের পাড়ে। ক্যালিফোর্নিয়া এমনিতেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এখানে দেখার মতো অনেক কিছুই আছে। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো হচ্ছে লস এঞ্জেলস, ব্রেভারলি হিলস, ব্রিসবেন, ক্যানিয়ন লেক, ম্যানহাটন বিচ, ক্যালিফোর্নিয়া সেটি, শান্তা বারবারা, ওয়েস্ট মিনিস্টার ইত্যাদি। হোটেলে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ নেই। ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। আদনান আরেফিন এলেন ঠিক আটটায়। তিনিই আমাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন। এটা আসলে ব্যবসায়ীদের নিজস্ব একটি অনুষ্ঠান। আমার সেখানে তেমন কোনো ভূমিকা নেই। স্থানীয় কয়েকজন বন্ধু-সহনের আমন্ত্রণেই এখানে আসা। আদনান বললেন- এখানে নাষ্ট করার কোনো দরকার নেই। তা ছাড়া খেয়ে মজাও পাবেন না খুব একটা।

একটা আলাদা লাইনে দাঁড়াতে হলো আমাদের। একজন একজন করে ডেকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। কিছুক্ষণ পর আমার ডাক পড়ল। আমার টিকিট দেখে বলল, তোমার টিকিট কনফার্ম করা নেই। ওদের বোকানোর চেষ্টা করলাম ই-টিকিট কনফার্ম করাই থাকে। একটু ভালোভাবে ঘেঁটেঘুটে দেখ। এত কথা শোনার সময় ওদের নেই। বলল তুমি যদি এখন যেতে চাও তাহলে তোমাকে অতিরিক্ত ৭০ ডলার পে করতে হবে। আর না হয় কালকে যেতে হবে। আমি প্রায় আর্টনাদ করে উঠলাম। আগামীকাল একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি সেখানে যাচ্ছি। আজ ন গিয়ে কাল যাওয়া না যাওয়া সমান কথা। মনে মনে ঢাকাখ ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সকে অভিসম্পত্তি দিয়ে পেমেন্টের জন্য কার্ডটা বাড়িয়ে দিলাম। করণ অভ্যন্তরীণ কানেক্টিং ফ্লাইটটা ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের সঙ্গেই করা ছিল। এত দীর্ঘ একটি ফ্লাইট কোনো খাবারদাবার ছাড়াই। অভ্যন্তরীণ সব ফ্লাইটে ক্যাটারিং সার্ভিস নেই। বললেই চলে। কিছু খেলে কিনে থেকে হবে। ওয়াশিংটন থেকে সেন হোজে যেতে ঢাকা থেকে সরাসরি কোনো ফ্লাইট পাওয়া গেল না। পড়লাম। বিকালে আরেকটি সেমিনার। তার আগেই আমরা গেলাম স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখতে। এত কাছে এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম ক্যাম্পাসটি না



চলুন পাশেই ইন্ডিয়ান একটা রেস্টৱেন্ট আছে। গাড়ি ছুটে চলছে। খব ছিমছাম পরিপাটি শহর। গাছের পাতাগুলো বিচ্ছিন্ন রঙ ধারণ করেছে। যেন একেকটি বিশাল পুষ্টস্বরক। সেন হোজের আবহাওয়া বেশ ভালো। সকালেই মন ভালো করার মতো বালমলে রোদ উঠেছে। এই শহরটি তথ্য প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক খ্যাতনাম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় এখানেই। খেয়াল করে দেখলাম ভারতীয়রা সংখ্যায় একটু বেশি। এখানকার আইটি সেন্টেরে ওদের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো। সেটা অবশ্যই কর্মগুণে। ব্যবসায়ীদের মতবিনিময় সভায় উপস্থিতি স্বল্প। সবাই যার যার কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বললেন। আলোচনায় প্রাধান্য পেল আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা এবং উত্তরণের উপায়। এখানে এ ধরনের আয়োজন প্রায়শই হয়ে থাকে। দুপুরের মধ্যে আলোচনা শেষ হলো। আগেই আমাদের জন্য একটা লিমিজিন ভাড়া করা ছিল। আমরা বেরিয়ে হয়। আগে কখনো কাজটি করিন। কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। সহযোগিতার জন্য আশপাশে কাউকে খুঁজে পেলাম না। শুধু আমিই নয়, এমন সমস্যায় অন্যন্য দেশের নাগরিকরাও পড়েছেন।

দেখার কোনো মানে হয় না। সত্যিই মনোমুদ্ধকর। ভবনগুলো সব একই রঙের। বিশাল সুবৃজ ঘাসের মাঠ, গাছগুলো বেশ পরিকল্পিতভাবে লাগানো। মাঠের শেষ প্রান্তে বিকালের বিষণ্ণ রোদ পড়েছে। বেশ নিরিবিলি ক্যাম্পাস। সবাই ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ ঘুরে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় খুবই নির্মম। রাতে ডিনার পার্টিতে নিম্নলিখিত। অতি প্রাচীন একটি বাড়িতে আয়োজন। বিশাল বিশাল ঘরদের। পুরোনো আমলের আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। ঘরের এককোণে গানের আয়োজন। মাঝে মাঝে কেউ কেউ কৌতুকও বলছে। সবকিছু মিলিয়ে বেশ সরগরম অনুষ্ঠান। পাশের কক্ষে খাবার সাজানো আছে। যার যার পছন্দ মতো খাবার তুলে নিয়ে থাকে। আমার দুচোখে রাজ্যের ঘূর্ম নামতে চাইছে। বলতে গেলে আমেরিকার এই কয়েকটি রাত-দিন নির্ধারণ কেটে যাচ্ছে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেশ রাত করে হোটেলে ফিরলাম। আগামীকাল সকালে আবার নিউইয়ার্ক যাত্রা। সবকিছু গুচ্ছিয়ে নিতে হবে। খুব ভোরে হোটেলের ইলেকট্রিক এলার্মের তীব্র চিৎকারে ঘূর্ম ডেঙে গেল। দরজা খুলে উঠি দিয়ে বোকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু করিডোরে

সময় স্বল্পতার কারণে এখানকার ঘনিষ্ঠ কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। এখানে সবাই ব্যস্ত। কাউকে ফোন করতেও সঙ্কেত হয়। কারণ আমেরিকায় কাজের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। কেউ সারারাত কাজ করে দিনে ঘূর্মায়। কেউ দুপুরে কাজ গিয়ে অনেক রাতে ফিরে। আবার কেউ কেউ ভোর থেকে রাতে বেরিয়ে যায়। তাহলে কোন সময় ফোন করলে কাকে পাওয়া যাবে সেটা বোকা মুশকিল। তবে কারো আন্তরিকতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্মম হয়ে উঠল সময়। দ্রুত ফিরতে হবে নিউইয়ার্ক। এতটা দূরে এসেও অনেক সৌন্দর্য উপভোগ না করার অতৃপ্তি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। সান্ত্বনা এটাই যে একবার যখন এসেছি তখন আরেকবার আসার সুযোগটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটু পর আপনি থেমে গেল শব্দ। সময় স্বল্পতার কারণে এখানকার ঘনিষ্ঠ কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। এখানে সবাই ব্যস্ত। কাউকে ফোন করতেও সঙ্কেত হয়। কারণ আমেরিকায় কাজের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। কেউ সারারাত কাজ করে দিনে ঘূর্মায়। কেউ দুপুরে কাজ গিয়ে অনেক রাতে ফিরে। আবার কেউ কেউ ভোর রাতে বেরিয়ে যায়। তাহলে কোন সময় ফোন করলে কাকে পাওয়া যাবে সেটা বোকা মুশকিল। তবে কারো আন্তরিকতার ক্ষেত্রে নির্মম হয়ে উঠল সময়। দ্রুত ফিরতে হবে নিউইয়ার্ক। এতটা দূরে এসেও অনেক সৌন্দর্য উপভোগ না করার অতৃপ্তি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। সান্ত্বনা এটাই যে একবার যখন এসেছি তখন আরেকবার আসার সুযোগটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট হওয়ায় একখণ্টা আগে এয়ারপোর্ট গেলাম। অনুষ্ঠানিকতা শেষ করে জানতে পারলাম ফ্লাইট দেরিতে ছাড়বে, তবে কে কটা দেরিতে সেটা স্পষ্ট নয়। এই সুযোগে সকালের নাস্তাটা সেরে ফেলা যায়। একেবারে রানওয়ের পাশাপাশে একটি ক্যাফেতে গিয়ে বসলাম। কফি আর ব্রেড নিলাম। বেশ আয়োশ করে খেলাম। তারপর রানওয়ের দৃশ্য দেখে খানিকটা সময় কাটল। তবে খুবই বিরক্তিকর সময়। ল্যাপটপটাও চার্জের অভাবে বিকল হয়ে আছে। সেন হোজে থেকে ফ্লাইট ছাড়ল এক ঘণ্টা দেরিতে। এবার আমেরিকান এয়ারলাইন্স। ট্রানজিট লস এঞ্জেলসে। বাড়ের গতিতে কাঞ্জিত টার্মিনালে এসে দেখি আমার ফ্লাইট নিউইয়ার্কের পথে এক ঘণ্টার দূরতে। গেটম্যান নির্বিকার। হায় কপল। উপরে উঠে এয়ারলাইন্সের কাউটার খুঁজে বের করলাম। কাউন্টারের নারীকে টিকিট্টা প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে জিঞ্জেস করলাম দোষটা কি তোমাদের না আমার? সেন হোজে থেকে ফ্লাইট ছাড়ল এক ঘণ্টা দেরিতে, তার খেসারত দিতে হবে আমাকে? কর্তব্যবরত নারী সবি, প্লিজ ইত্যাদি বলে বেশ দুঃখিত হবার ভঙ্গি করল। তারপর বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

আমার টিকিটটা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। যেন এই জীবনে বস্তা সে প্রথম দেখেছে। এটাই পেশাদারিত্ব। প্রায় প্রতিদিনই সম্ভবত এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় ওদের। আমাকে নিশ্চুপ দেখে মহিলা এবার মুখ খুললেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, আমি দুঃখিত। তোমার নেক্সট ফ্লাইট আট ঘণ্টা পর। তোমাকে আমরা বেশ কয়েকটা খাবার কুপন দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের নির্ধারিত রেস্টুরেন্টে থেকে পারবে বলে আমাকে কয়েকটা খাবার কুপন ধরিয়ে দিল। এখন আর সত্যি সত্যি কিছু করার নেই। মনে মনে বললাম তা না হয় মানলাম, তোমরা খাবারের ব্যবস্থা করেছি কিন্তু দুর্বিশহ ৮ ঘণ্টার কি হবে!

কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এলাম। সুবিশাল এয়ারপোর্টের এ মাথা ও মাথা একবার হাঁটলাম। চার্জিং প্যানেল খুঁজে বের করে ল্যাপটপটা চার্জ দিয়ে খুলে বসলাম। অন্তত দুএক ঘণ্টা ভালোই কাটবে। নিউইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মালপত্র বুঝে নিয়ে বের হতে হতে সকাল প্রায় নয়টা বাজল। হিসাব করে দেখলাম একবারের পাক্ষ চরিশ ঘণ্টার জারি। আমেরিকার ভেতরেই এত দীর্ঘ জারি। একবারে পশ্চিম থেকে পুরুণাত্মে। প্রশান্ত মহাসাগরের পাড় থেকে আটলাটিকের পাড়ে।

রোমান মামা আমার জন্য এয়ারপোর্টের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তখন আমেরিকায় সামারের শেষ মুহূর্ত। ঠান্ডা মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে। দ্রুত গিয়ে গাড়িতে বসলাম। মামা ফল থেকে দিলেন। দীর্ঘ ক্লান্তিকর ভ্রমণের খবরটা তিনিও জানতেন। গাড়ি ছুটছে ক্রকলিনের দিকে। মামা থাকেন ক্রকলিনের ওশান পার্কওয়েতে। পথের দুপাশেই পরিকল্পিতভাবে গাছ

লাগানো। ধীরে
ধীরে পাতার রং
বদলে
যাচ্ছে।

বাসায় ঢোকার পথে একটা দেওদার গাছ চোখে পড়ল। কঠিন তুষারপাতেও ওরা সঙ্গীব। আমাদের হিজল যেমন বড়-জলেও দিব্য বেঁচে থাকতে পারে। বাসায় পৌঁছাবার পর আপাতত স্থিতি। আগেই জেনেছি এই বাসাটা ব্যাচেলরদের স্বর্গরাজ্য। পুরো অ্যাপার্টমেন্টে সব ব্যাচেলরদের আজ্ঞাখানা। সে কারণেই এখানে উঠেছি। কোনো খবরদারি নেই। স্বাধীনতা অফুরান। রোমান আত্মীয়তার সূত্রে আমার মামা হওয়ায় রোমানের সব বক্ষ রাতারাতি আমার মামা হয়ে গেল, আবার আমি ও তাদের মামা। সবাই বলল শাওয়ার নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ঘুমানো যাবে না। তাহলে প্রতিদিনই দিনের বেলা ঘুম আসবে। এ দিকে আবার শ্যামল মামার (রোমানের বক্ষ) বিয়ে। বর-কমে একই অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা। সুতরাং চারপাশে উৎসব উৎসব আমেজ। আসতে না আসতেই বিয়ের দাওয়াত। মন্দ না!

বিকাল থেকেই ঘোরাঘুরি শুরু। বাংলাদেশ থেকে কেউ নিউইয়র্কে বেড়াতে গেলে তার জন্য দর্শনীয় স্থানের যে তালিকা নির্ধারণ করা হয় তার মধ্যে অবশ্যই টাইম স্কয়ার এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টি থাকবে। বাংলাদেশে যেমন গ্রাম থেকে কেউ ঢাকায় বেড়াতে গেল চিড়িয়াখানা এবং জানুয়ার অবশ্যই দর্শনীয় হয়ে ওঠে, ঠিক সেরকম। নিউইয়র্কে আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতয় ঘটল না। আনোয়ার মামা আর আমির হোসেন মামা যথারীতি নিয়ে গেলেন টাইম স্কয়ারে। এই জয়গাটি রাতেই বেশ সুন্দর। সবকিছু অবশ্য রঙিন আলোকসজ্জাৰ কারসজি। বড় বড় সব বিলবোর্ড। উচু দলালগুলোর গায়ে চলছে লেজার লাইট শো। হাজার হাজার পর্যটকের ভিড়। এখান থেকেই আম্পায়ার স্টেট বিস্তারের উচু চূড়াটা দেখা যাচ্ছিল। তার আগেই এডউন জিরো দেখেছি। নতুন ভবন হয়েছে সেখানে। বাসায় ফেরার পথে আনোয়ার মামা ক্রকলিন ব্রিজ এবং ম্যানহাটন ব্রিজ সম্পর্কে ধারাভাষ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে সবকিছুই লাগছিল। গোলকবাঁধার মতো। প্রথম প্রথম এমন হওয়াটাই নাকি স্বাভাবিক। পরে অবশ্য পাশাপাশি এই দুটি ব্রিজের অবস্থান

ও পার্শ্বক্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। পরের দিন সেই স্ট্যাচু অব লিবার্টি। এবার সঙ্গী রোমান মামা। ফেরিঘাট অবধি খানিকটা পাতাল রেল, বাকিটা হেঁটে হেঁটে দেখতে দেখতে। টিকিট কেটে ফেরিতে ওঠার আগে সিকিউরিটি চেক হলো। মনে হলো মেন প্লেনে উঠতে যাচ্ছি। শেষ গ্রীষ্মের রেন্ডেজুল দিন। ঠান্ডা নেই বললেই চলে। আমাদের মাথার ওপর কয়েকটা সি-গাল উঠেছে। ফেরির গতিবেগের সঙ্গে ক্রমেই স্ট্যাচু অব লিবার্টি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। অদূরে ভেরাইজনা ব্রিজ। আর হাতের কাছেই হাত্তমন নদী। গতবেয়ে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগল না। স্ট্যাচু অব লিবার্টি স্থাপন করা হয়েছে ছোট একটা দ্বীপে, নাম লিবার্টি। দ্বীপের এককোণে মৃত্তিটি আর বাকিটা পর্যটকদের ঘোরাঘুরির জন্য উন্মুক্ত। মাঝারি আকৃতির গাছপালায় সুসজ্জিত। এক সময় ভেতরের সিঁড়ি পথ দিয়ে মৃত্তির ঠিক মাথার কাছে চলে যাওয়া যেত। এখন নিষিদ্ধ। আমরা চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ছবি তুললাম অসংখ্য। এই বিশাল মৃত্তিটি ফালগের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে ভালোবাসার নির্দশন স্বরূপ ১৮৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর আমেরিকাকে উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। ফিরে যাবার জন্য আবার ফেরিতে উঠলাম। মাবাপথে একটি সুবিশাল নরওয়েজিয়ান জাহাজ আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। ঠিক জাহাজ নয়, যেন ছেটখাটে একটি গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। ওপাড়ে এসে নদীর তীর ধরে হাঁটতে লাগলাম। এই নদীপথও নিউইয়র্কের রাস্তার মতো ব্যস্ত। ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য মৌখ্য। চমৎকার আবহাওয়া। কোনো কোলাহল কিংবা বাস্তু নেই। ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্রকলিন এবং ম্যানহাটন ব্রিজ। আমরা কিছুক্ষণ নদীর পাড়ে বসলাম। শীতল বাতাস এসে বাপটা দিচ্ছে চোখে মুখে।

লেখক: উত্তি, প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক
লেখক; সাধারণ সম্পাদক, তরংপন্থ





COLORFUL HILL TRACTS

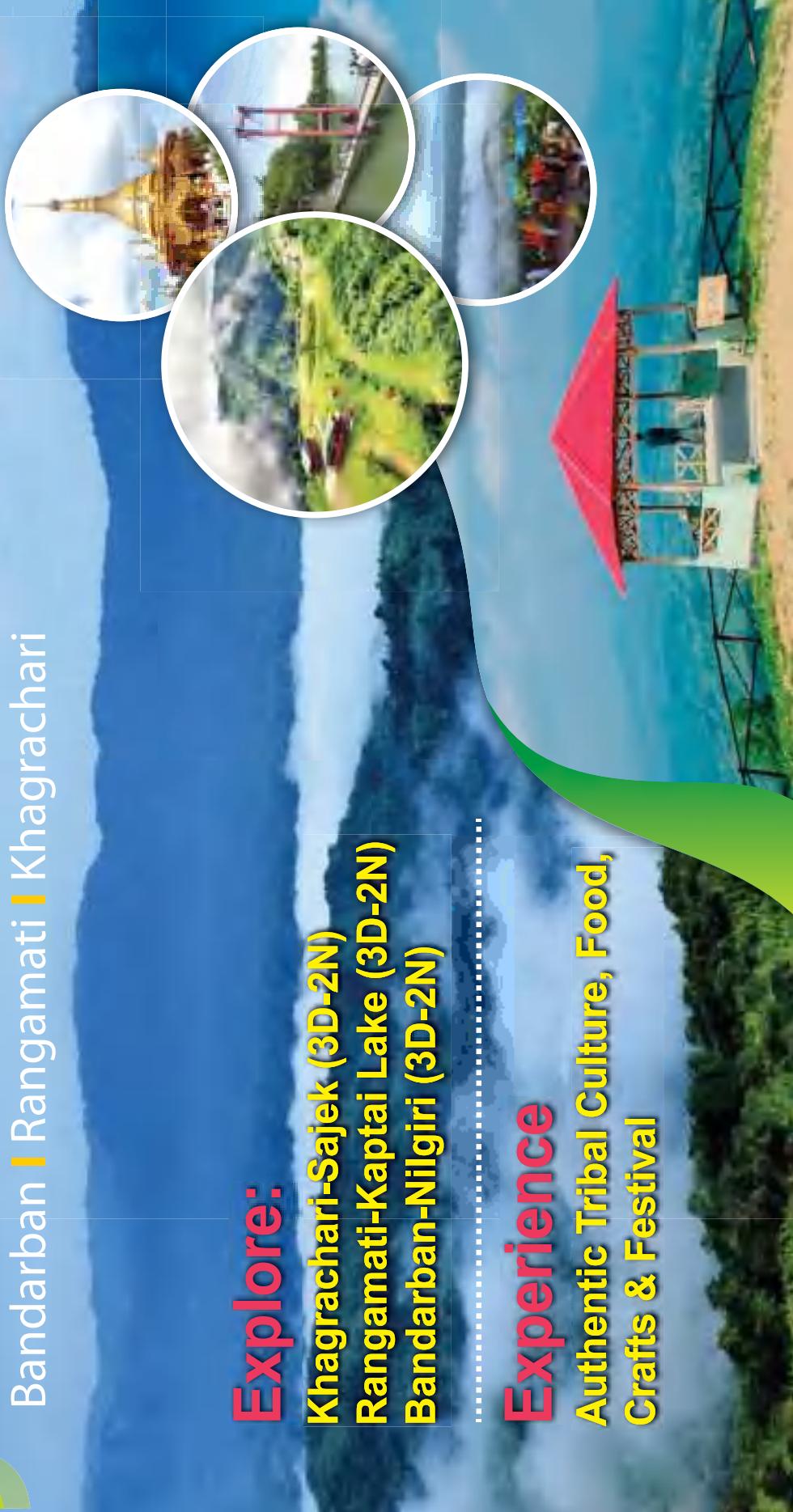
Bandarban | Rangamati | Khagrachari

Explore:

Khagrachari-Sajek (3D-2N)
Rangamati-Kaptai Lake (3D-2N)
Bandarban-Nilgiri (3D-2N)

Experience

**Authentic Tribal Culture, Food,
Crafts & Festival**



Please contact
for more details

RIVER AND GREEN TOURS

House-97/1, Flat-2B, Shukrababu, Dhanmondi, Dhaka-1207
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com

www.riverandgreen.com

+88 01819224593
+88 01730450099





অটোয়ার শীত

কল্পনা

■ মো. আনিসুর রহমান

পিইচি করতে কানাডার অটোয়াতে গিয়েছিলাম ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে। তখন সেখানে হেমন্তকাল। হাঙ্ক শীতে বাইরে যেতে তখন পাতাল জ্যাকেটই যথেষ্ট। সবুজ ম্যাপল গাছের পাতাগুলো নানা বর্ণ ধারণ করে আস্তে আস্তে ঝরতে শুরু হয়েছে। দিন যাত যাচ্ছিল শীত তত বাহিল। বাইরে যেতে পুর জ্যাকেটের পাশাপাশি হাতমোজা, গলাবদ্ধনী, শীতুপি, শীতকালীন বুট ইত্যাদিও অপরিহার্য হয়ে উঠলো। আস্টেবারের শেষের দিকে তাপমাত্রা হিমাক্ষের নিচে নামল। তখন অপেক্ষা করছিলাম কবে দেখব প্রথম তুষারপাত। নভেম্বরের এক সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বাতাসে ছাইয়ের মতো কি যেন ভাসতে ভাসতে মাটিতে নামছে। প্রথমে বুরো উঠতে পারিনি কী ঘটছে। একটু পর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘাসের ওপর সাদা আস্তরণ। বুরো গেলাম এটাই সেই কাঞ্চিত তুষারপাত। জ্যাকেট পরে বাইরে গিয়ে সেই তুষার যখন হাত দিয়ে ধরছিলাম তখন একেবারেই অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল যার সাথে পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতাই মেলে না। মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালাম। কত বেচিত্য নিয়েই না তিনি এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন!

প্রথম প্রথম তুষারপাত শুরুর পর কয়েক ঘণ্টা চলত। এক-দুদিন পর তা গলেও যেত। তুষার গলে গলে রাস্তা কাদা কাদা হয়ে যায়। নগর পরিসেবার বিশেষ গাড়িতে তখন রাস্তা পরিষ্কার করে। জানুয়ারির প্রথম দিক থেকে তাপমাত্রা কখনো কখনো হিমাক্ষের ৩০ ডিগ্রি নিচেও নেমে যায়। বাতাসের কারণে সেই তাপমাত্রা মনে হয় আরও অনেক কম। এই জন্য আবহাওয়া পূর্বাভাসকারী সংস্থা দুই ধরনের পরিমাপক প্রকাশ করে- মূল তাপমাত্রা (temperature) এবং অনুভূত তাপমাত্রা

তীব্র তুষার বাড় হলে দিনের বেলাও মনে হবে যেন রাতে আঁধার নেমে এসেছে। তুষার গলে পানি হওয়ার পর হঠাতে করে তাপমাত্রা কমে গেলে রাস্তার ওপর হালকা বরফের স্তর জমে। একে বলে ইয়েথপশ ওপব। ব্ল্যাক আইসের ওপর গাড়ি চালানো খুবই ঝুকিপূর্ণ। এরকম পরিবেশে আমার গাড়ি একবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিকের লেন অতিক্রম করে রাস্তার পাশে জমে থাকা এক ফুট উচ্চ তুষারের স্তুপের ওপর উঠে গিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে, বিপরীত দিক থেকে তখন কোনো গাড়ি আসেনি।

(wind chill)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস সঠিক হয়। কেউ বাইরে যাওয়ার আগে পূর্বাভাস অনুযায়ী শীত প্রতিরোধক প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়। বাসগৃহ, অফিস, স্কুল, যানবাহন, দোকানপাটা সবই কৃতিমভাবে উঁফ রাখা হয়। উন্নতস্থানে থাকাকালীনই শুধু শীতের তীব্রতা অনুভূত হয়। তাও ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত শীতকালীন পোশাক পরে চলতে তেমন অসুবিধা হয় না। তাপমাত্রা আরও কমলে বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে কানের লতি জমে খসে পড়ে বা ত্বকের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। একে বলে Frostbite। একবার ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (রিহফ পর্যবর্ষ -৪৫) এর মধ্যে যখন মেট্রোরেল থেকে ক্লাসরমের দিকে চোখ ছাড়া বাকি

সবকিছু ঢেকে ঢুকে যাচ্ছি তখন মনে হচ্ছিল ঢেখের মধ্যে কেউ যেন সুচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। নিঃশ্বাসে যতটুকু জলীয় বাস্প ছিল তা নাক থেকে বেরিয়েই বরফ হয়ে ভুরুতে জমা হচ্ছিল। ঢেখের পানি বরফ হয়ে পাপড়ি ফেলা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। দৌড়ে বিস্তৃত উঁফ পরিবেশে ঢুকে তবেই হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

জানুয়ারি থেকে মার্চ এই সময়টায় তাপমাত্রা যেমন কম থাকে তেমনি তুষারপাত একবার শুরু হলে কয়েকদিন ধরে চলে। রাস্তা-ঘাট আড়া অধিকাংশ জায়গায়ই কয়েক ফুট বরফের নিচে ঢাকা থাকে। অবস্থা বেশি খারাপ হয় যখন তুষার বাড় হয়। এ সময় বাইরে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নয়।

তুষারের কণা শরীরের উন্নত স্থানে তীব্রের মতো বিদ্ধিতে থাকে। রাস্তা পিছিল হয়ে যায় বলে গাড়ি প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ হারায়।

তীব্র তুষার বাড় হলে দিনের বেলাও মনে হবে যেন রাতে আঁধার নেমে এসেছে। তুষার গলে পানি হওয়ার পর হঠাতে করে তাপমাত্রা কমে গেলে রাস্তার ওপর হালকা বরফের স্তর জমে। একে বলে ইয়েথপশ ওপব। ব্ল্যাক আইসের ওপর গাড়ি চালানো খুবই ঝুকিপূর্ণ। এরকম পরিবেশে আমার গাড়ি একবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিকের লেন অতিক্রম করে রাস্তার পাশে জমে থাকা এক ফুট উচ্চ তুষারের স্তুপের ওপর উঠে গিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে, বিপরীত দিক থেকে তখন কোনো গাড়ি আসেনি। কয়েকদিন তুষারপাতের পর যখন সূর্যের দেখা পাওয়া যায় মন্টা ভালো হয়ে যায়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে রৌদ্রজ্বল প্রকৃতি দেখে মনে হবে বাইরের উঁফতায় একটু বেড়িয়ে আসি। কিন্তু ভুল। সূর্যালোকের উপস্থিতি মানেই উত্তাপ নয়। কম প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে বাইরে গেলেই তা হাড়ে হাড়ে ঢের পাওয়া যায়।

উত্তর মেরুর কাছাকাছি বলে শীতকালে রাত অনেক বড় (১৫-১৬ ঘণ্টা) এবং দিন অনেক ছোট (৮-৯ ঘণ্টা) হয়। শীতের সাথে যুদ্ধ করতে শরীর সতেজ রাখতে যথেষ্ট ঘুমাতে হয়। জেগে থাকা অবস্থায় বারবার চা-কফি খেতে হয়। প্রচুর ফল, সবজি এবং অন্যান্য ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হয়। ঘরের মধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম করতে পারলে আরও ভালো। তাই বলে অটোয়াবাসী কি পুরো শীত নিরানন্দে বন্দি অবস্থায় থাকেন?

একেবারেই না। শিশু-কিশোররা তুষার দিয়ে বল বানিয়ে ছোড়াডুড়ি করে মজা করে। কেউ কেউ তুষারের স্তুপ করে তৈরি করে নানা ঢঙয়ের তুষার-মানব (snow man)। তুষারপাতাইন আলোকজ্বল দিনে ছেলে-মেয়ে নবীন-প্রবীণ অনেক মানুষই বেরিয়ে পড়েন ওপর Skating-এ। অটোয়া শহরের পাশ দিয়ে চলা অটোয়া নদী এবং শহরের মধ্য দিয়ে চলা রিডো ক্যানালসহ সব জলাশয়ের জলই তখন পুর বরফে পরিণত হয়। গ্রীষ্ম কিংবা হেমন্তের প্রবাহমান নদী খখন শীতে বরফে পরিণত হয় তার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর অনুভূতিই অন্যরকম।

চারদিকে বরফের শুভতা হৃদয়ে অন্যরকম দ্যোতনা সৃষ্টি করে। কেউ কেউ নদীর উপরিতলের পুর বরফ খুড়ে তার মধ্যে বড়শি ফেলে বরফের তলে প্রবাহমান হিমশীতল পানিতে থাকা মাছ শিকার করেন। আবার কেউ কেউ আইস হকি খেলেন, ক্ষিয়িং করেন, যোবোর্ডিং করেন। আইস স্কেটিং করার জন্য আমিও একজোড়া স্কেটস কিনেছিলাম। অল্প অল্প শিখেছিলাম।

তবে আমার বেশি ভালো লাগত বরফ-নদীতে বা বরফ-খালে হেঁটে বেড়াতে। আমার বাসা নদীর পাশে এবং বিশ্ববিদ্যালয় খালের পাশে হওয়ায় এই সুযোগটা আমি বরাবরই পেতাম। জন্মারিতে সিটি সেন্টারের কাছে রিডো ক্যানেলের পাশে ডরহংবংঘঁব নামে একটা উৎসব হয়, যেখানে বরফের চাঁই কেটে কেটে তৈরি করা হয় অস্তরে সুন্দর সব ভাস্কর্য। কানাডা-আমেরিকার অন্যান্য শহর থেকেও লোকেরা ভিড় জমায় সেইসব ভাস্কর্য দেখতে।

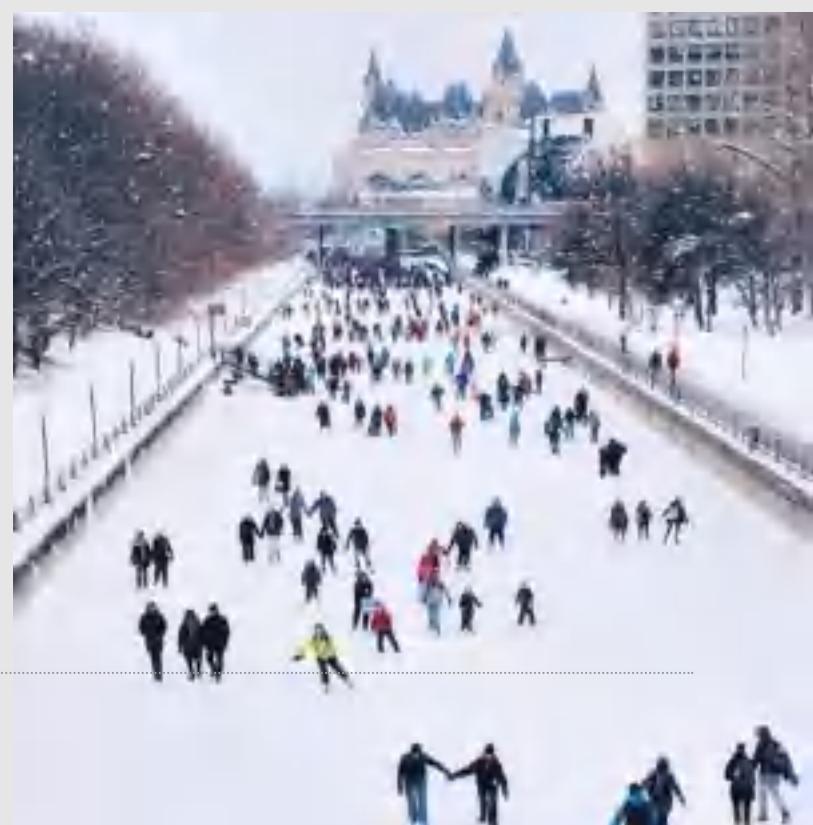
ফেরুয়ারির শেষের দিকে নদীর বরফ খখন গলতে



শুরু করে সেটাও এক সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করে। প্রথমে বড় বড় বরফের টুকরো ভাসতে থাকে, যা গলে গলে ক্রমশ ছোট হতে থাকে। নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই দৃশ্য দেখার মজাই অন্যরকম। তিন-চার মাস তুষারের নিচে চাপা থাকা ধূসুর ঘাস তুষার গলে যাওয়ার সাথে সাথে আবার সজীব হয়ে সবুজ হয়ে ওঠে। পত্রবিহীন গাছগুলো

আবার পাতা ছাড়তে শুরু করে। শীতে হারিয়ে যাওয়া পাথিদের কিচিরিমিচির আবার শুরু হয়। কান্না-হাসির দোল দেলানো আমাদের জীবনও যেন প্রকৃতির ধাতু বৈচিত্র্যকেই ধারণ করে!

লেখক: অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ◆





ঘুরে এলাম সুইডেনমার্ক

■ মো. সাহিদ হোসেন

ভূগোল বইয়ে নাতশীতোষ্ণ অঞ্চল হলেও আমাদের দেশটা আসলে গ্রীষ্মপৃথক দেশ। শীতথান দেশে গেলে বিয়টা উপলব্ধি করা যায়। গত মে মাসে সুইডেন আৰ ডেনমার্ক ঘুরে এসে ব্যাপারটা আমাৰ কাছে এমনই মনে হয়েছে। দেশে তখন প্যাচপ্যাচে গৰম, বৃষ্টিতে রাখা জলমগ্ন, গাড়ি ডুবুডুবু, এয়াৱাপোটে পৌছাতে পাৰব কিনা- সংশয় মনে। একই সময়ে ইউরোপে বালমালে রোদেৰ মাৰোও কলকনে ঠাণ্ডা বাতাস কাবু কৰে দেয় আমাদেৰ মতো অনন্যস্ত এশীয়দেৱ।

১০ মে, ২০২২। সুইডেনেৰ স্টকহোমেৰ আৱলাভা এয়াৱাপোট থেকে আনুষ্ঠানিকতা সেৱে বেৰ হতে অনেকখানি সময় লাগলো। দাঙ্গৰিক কাজে সুইডেন এসেছি। টিমেৰ অন্যদেৱ থেকে আমি আলাদা, ফ্লাইটেৰ ভিত্তাৰ কাৰণে। দেখা হবে চাৰ-পাঁচ ঘণ্টা ট্ৰেন দূৰত্বে কালমাৰ শহৰে। কালমাৰ পৰ্যট পৌছানোৰ তিনটা ট্ৰেন টিকিট আয়োজকৰা আমাকে আগেই পাঠিয়েছে। প্ৰথমে এয়াৱাপোট থেকে স্টকহোম সেন্ট্রালেৰ ট্ৰেন খুঁজে বেৰ কৰলাম পুলিশৰ সহায়তায়। কিষ্ট টিকিটে লেখা সময় অনুযায়ী এখনো ট্ৰেনেৰ সময় হয়নি। একটু সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে আবাৰ জিজেস কৰলাম। মহিলা পুলিশ কিছুটা বিৰক্ত হয়ে বললো, ‘এটাই স্টকহোম সেন্ট্রালেৰ ট্ৰেন। উঠে পড়ো।’

উঠে পড়লাম। ট্ৰেন ছাড়ল। ৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰমেৰ নিৰ্ধাৰিত সময় ১৮ মিনিট। সামনেৰ মনিটৱে ট্ৰেনেৰ গতি দেখা যাচ্ছে। ১৭০, ৮০, ৯০, মাৰে মধ্যে ২০০ পেৱিয়ে যাচ্ছে। আয়েশি ভ্ৰমণ উপভোগ কৰছি। এৱে মধ্যেই আয়েশ ভঙ্গকাৰী টিকিট চেকাৱেৰ আগমন!

টিকিটেৰ বদলে সবাই মোবাইল ফোন এগিয়ে দিচ্ছে। আমি প্ৰিন্ট কৰা কাগজটা এগিয়ে দিলাম। ক্ৰ কুঁচকালো চেকাৱ। আমাৰ টিকিট পছন্দ হয়নি! আমি নাকি লোকাল ট্ৰেনেৰ টিকিট নিয়ে এক্সপ্ৰেস ট্ৰেনে উঠেছি। আমাৰ কী দোষ? আমি তো পুলিশকে জিজেস কৰেই ট্ৰেনে উঠেছি।

‘তাহলে বাঢ়তি ভাড়া নিয়ে নাও’, আমি বললাম। ‘হবে না,’ চেকাৱ বললো। ‘এটা অন্য কোম্পানিৰ ট্ৰেন। গন্তব্যে গিয়ে পুৱো ভাড়া দিয়ে নতুন টিকিট কিনতে হবে।’

তাই হলো। সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে চেকাৱ আমাকে টিকিট কাউটাৱে নিয়ে গেলো এবং বেশ কিছু টাকা গচ্ছা দিয়ে আবাৰ টিকিট কিনলাম।

কালমাৰেৰ পথে আমাৰ পৰবৰ্তী গন্তব্য আলভেন্স জংশন। ওখানে গিয়ে আবাৰ ট্ৰেন বদল কৰতে হবে। টিকিট চেকাৱ আমাকে বুবিয়ে দিলো কোন প্লাটফৰ্মে যেতে হবে। ১০ নংৰে প্লাটফৰ্ম খাঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। টিকিটেৰ তথ্য অনুযায়ী যে ট্ৰেনে উঠলাম, এটিৰ গন্তব্য কোপেনহেগেন। আমাকে মাৰপথে নেমে পড়তে হবে। সামনে বসা সহ্যাত্মকে টিকিট দেখিয়ে নিশ্চিত হলাম আমি আৱ ভৱেলৰ কঞ্জে নেই। আলভেন্স ট্ৰানজিট মাত্ৰ ১২ মিনিটৱে। সহ্যাত্মক আশ্বস্ত কৰলেন- সমস্যা হবে না। উনিষ্ঠ কালমাৰ যাবেন। ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ড নিয়ে ট্ৰেনে বসেই দেশে কথা বললাম, যদিও গন্তব্যে পৌছাইনি এখনো। মনে পড়লো ১৯৮০ সালে লিবিয়ায় পৌছানোৰ প্ৰায় দুই মাস পৰ দেশ থেকে প্ৰথম চিঠি পেয়েছিলাম।

নিৰ্ধাৰিত সময়েৰ তিন মিনিট পৰ ট্ৰেন আলভেন্স থামলো। পাশেৰ প্লাটফৰ্মে দাঁড়ানো কালমাৰেৰ ট্ৰেনে উঠে বসলাম। সহ্যাত্মক এবাৰ অন্য কামৱায়।

এবাবের অমগ স্বল্প সময়ের। কালমারে ট্রেন থামলো শেষ বিকালে। ট্রেন থেকে নেমে আশপাশে তাকালাম। গতকাল ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছি। রাত কেটেছে দুবাই এয়ারপোর্টে। আজ সারাদিন আকাশে আর রেলপথে। কোনো চেনা মুখ দেখিনি। সুইডিশ সহকর্মী আনা মারিস এগিয়ে এসে আমার সুটকেস হাতে নিলো। ভিন্ডেশে, অচেনা জনপদে এই চেনা বিদেশিনিকে এই মুহূর্তে অনেক আপন মনে হলো। আনার বন্ধুর গাড়িতে হোটেলে পৌছালাম। ক্লান্ত শরীরে একটি খিতু হওয়ার সুযোগ পেলাম।

আমাদের প্রতিষ্ঠান এমআরডিআই থেকে একটা বড়সড় দল সুইডেনে এসেছি, সাথে কয়েকজন সাংবাদিকও রয়েছেন। তবে সবার অংশগ্রহণ এক রকম নয়। আমরা বিভিন্ন গ্রন্তি ভাগ হয়ে ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ও কনফারেন্সে অংশ নিচ্ছি।

কালমার একটা নিরবিলি, ছিমছাম ও সুন্দর শহর। এখানকার নিনিয়াস ইউনিভার্সিটির ফোয়ো মিডিয়া ইনসিটিউট আমাদের প্রোজেক্ট পার্টনার। সে সুবাদেই আমাদের এই সফর। কালমারে আমরা পুরো দুদিন যেকেছি। ফোয়ো মিডিয়া ইনসিটিউট আর কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভিজিট করেছি। এর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য- প্রাচীনতম দৈনিক

Barometer কার্যালয় পরিদর্শন। ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত সুইডিশ ভাষার এই পত্রিকাটি এখনো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। যদিও ডিজিটাল বিকাশ, মহামারি, মিডিয়া জগতে পরিবর্তনের ধারা- এসব কারণে পত্রিকা ব্যবস্থাপনা, পাঠকের সংখ্যা ও ধরনে উত্থান-পতন হয়েছে। সম্পাদক ও অন্যদের সাথে বৈঠক শেষে পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখলাম। মনে পড়লো ৪৩ বছর আগে ১৯৭৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে দিল্লিতে Times of India পত্রিকার অফিস পরিদর্শন করেছিলাম। পত্রিকা অফিসের চেহারা একেবারেই ভিন্ন। টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার, এডিটিং, পেজ মেকআপ টেবিলের জায়গ দখল করে নিয়েছে শুধুই কম্পিউটার। প্রযুক্তির উন্নয়ন পরিবর্তন এনেছে মানুষের চিন্তায়, আচরণে।

কালমারের পর আমাদের গন্তব্য আনার বাড়ি। একটা মাইক্রোবাসে আমরা পাঁচজন আর সুইডিশ সহকর্মী মারিয়াকে নিয়ে আনা নিজেই ভাইত করে রওনা হলো। পথে একটা সুপার মার্কেটে সবাই কিছু কেনাকাটা করলো। আমি কিনলাম একটা বেল্ট। কারণ দুবাই এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি চেকের পর বেল্টটা ওখানে ফেলে এসেছি। আরেক জায়গায় থেমে আনার মেয়ে আর ওর বাস্কিটে উঠিয়ে নিলাম।

আজ পাড়া গাঁ বলতে যা বোঝায়, আনার বাড়ি তেমনই এক জায়গায়। শান্ত, সুবোধ বাল্টিক সাগরের পাড়ে সুন্দর বিতল বাড়ি। আজ আমাদের খাওয়া আর আলসেমি করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। বাড়িটার চারপাশ খোলা। এটা কোনো সাজানো গ্রাম নয়। একটু দূরে দূরে বাড়ি। যেদিকে সাগর ওই পাশটাতে একটা খোলা চতুর। বেশ কিছু গাছপালা রয়েছে। বাড়ি আর সাগরের মাঝখানে কিছু বোপাবাড়। সাগরের পাড়েঘেঘে কাঠের চমৎকার ওয়াকওয়ে। আমি, দোলন আর আনা হাঁটতে বের হলাম। পাড়ে ছোট-বড় বেশ কিছু বোট নেওয়া করা। এর মাঝে ছোট একটি বোট আনার। মেয়েকে নিয়ে মাঝে মাঝে রোয়িং করে। আনা আমাদের জন্য খাওয়া ওয়ার অনেক আয়োজন করেছে। দৃশ্যের আর রাতের (বিকালে) খাবার সেরে আমরা ভ্যাকো (Vacaux) নামে ছোট একটা শহরে



গোলাম। এখানকার হোটেলেই আজ রাত যাপন। ফুলের শহর ভ্যাকো। ইউরোপে এরকম অনেক শহর আছে বলে শুনেছি। দেখা হয়েছে খুব কমই। ১৯৮৩ সালে নবপরিগোতাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এরকম এক সুন্দর শহরে। প্যারিস থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে সেই ছোট শহর ভিশি। এখানে আমাদের অবস্থান স্বল্প সময়ের। দাঙ্গিরিক কোনো কাজ নেই। সকালে নাশতার পর আমি, সেনিল আর দোলন হাঁটতে বের হলাম। রাস্তায় মানুষজন খুব কম। ব্যস্ত ঢাকা শহর থেকে এসে ব্যাপারটা একটু অস্থির। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির সামনে থামলাম। বাড়ির ছাদে একটা টিভি এন্টেনা লাগানো। যে প্রযুক্তিকে আমরা ২০ বছর আগেই বিদ্যুৎ জানিয়েছি। সুইডেনের তো দেশে ব্যাপারটা বিস্ময়েরই!

ভ্যাকো থেকে ট্রেনে স্টকহোম পৌছালাম বিকালে। সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে হেঁটে হোটেলে গোলাম। এই জায়গাটা একটি বিভাস্তিকর। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে হোটেল লবিতে এসে চাবি নিয়ে লিফটে এক ধাপ নেমে রুমে গোলাম। রুমের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি- খোলা আকাশের নিচে রেন্জাইন, ট্রেন। ভূমি উচ্চতার এই বিষয়টি আমার কাছে রহস্য হয়েই রইলো।

স্টকহোমে তিনদিন আমাদের বেশ ব্যস্ততায় কাটলো। এর মাঝে রয়েছে আইটিপি কনফারেন্সের উদ্বোধন, ফোয়ো মিডিয়া ইনসিটিউট স্টকহোম অফিসে কয়েকটি মিটিং, কয়েকটি পত্রিকা ও টিভি স্টেশন পরিদর্শন। আইটিপি কনফারেন্সে আমাদের এঙ্গিকিউটিভ ডি঱েন্টের হাসিবুর রহমান, সহকর্মী লাবণ্য আর চেনা অচেনা কয়েকজন সাংবাদিকের



সাথে দেখা হলো । পরদিন শহরতলির দিকে একটি কমিউনিটি পত্রিকা অফিসে গেলাম । নির্ধারিত সংযোগ পত্রিকা তালিকাভুক্ত পাঠকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় । পাঠকের কাছে খবর পৌছানোই লক্ষ্য ।

এ পর্যায়ে আমাদের একপ আবার বিভাজিত হলো । আমি, তানিম, লাবণ্য আর কোয়ের সহকর্মী মারিয়া- এই চারজন সিডা আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য স্টকহোম থেকে চার ঘণ্টা বিশ মিনিট ট্রেন দূরত্বে হারানোস্যান্ডে হাজির হলাম ।

হারানোস্যান্ড একটি প্রায় জনবিল শহর । কিছুক্ষণ পর পর রাস্তায় একটা গাড়ি দেখা যায় । তবে সবাই শৃঙ্খলা মেনে চলে শতভাগ । গাড়ি থাকুক বা না থাকুক, লাল সিগন্যালে অবশ্যই থেমে থাকবে, সবুজ বাতি না জ্বলা পর্যন্ত । রাস্তার পাশে একটু উঁচু সাইকেল লেন, আরেকটু উঁচুতে ফুটপাত । অনভ্যন্ত আমি সাইকেল লেন দিয়ে হাঁটছিলাম । মারিয়া আমার ভুল ধরিয়ে দিলো ।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি পরিবেশ অনুকূল । নাশতায় ডিম ছাড়া আর কোনো খাবারে প্রাণিজ আমিষ নেই । পুরো কেন্দ্রটি সৌর বিদ্যুতে পরিচালিত । খোলামেলা অবস্থানে বিদ্যুতের ব্যবহারও কম । কেন্দ্রের পাশেই একটা জলাশয় । গাছপালা, ফুল, পাথি- কোনো কিছুই কর্মতি নেই ।

বিচিত্র সব গাঁচিল, কুবুতরের ওড়াড়ি, জলাশয়ে হাঁস আর মাছরাঙার দাপাদাপি । ট্রেন অবগের সময়ও প্রচুর জলাশয় দেখেছি । আনাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সুইডেনে এরকম এক হাজার লেক আছে ।

গ্রিন এনার্জি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে

উইন্ডমিল আর সোলার প্যানেল । জলবায়ু

পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বৈশিক অঙ্গীকারের প্রতি সুইডেন শুকাশীল ও যত্নবান ।

তিনিদিনের কর্মশালায় ছিল একটি আনন্দময় শিখন পরিবেশ । এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের প্রায় ৪০ জন অংশগ্রহণকারী ক্লাসরূম সেশন, একপ ওয়ার্ক আর গেমে স্বতঃফুর্তভাবে অংশ নিয়েছেন ।

হারানোস্যান্ড থেকে আবার ভাগ হয়ে তানিম আর মারিয়া চলে গেলো উত্তর সীমান্তে লুলিয়া শহরে, আমি আর লাবণ্য স্টকহোমে । আবার ভাগ হয়ে লাবণ্য চলে গেলো ওর টিমে যোগ দিতে, আমি

হাঁটতে হাঁটতে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে আর ক্যাটারিনার সাথে ফোনে কথা বলে কাছাকাছি পৌছে গেলাম । কিন্তু ওদের দেখা পাচ্ছি না । আমার অবস্থানও ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না । ক্যাটারিনা আমাকে বললো, ‘তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আর একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম । কাউন্টারে বসা তরণী হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো । হয় তো ভেবেছে আমি একজন ক্লায়েন্ট । টেলিফোনটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘কথা বলো’ । একটু অবাক হয়ে সে টেলিফোন হাতে নিলো । সুইডিশ ভাষায় কিছু কথেপকথন হলো । টেলিফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে তরণী বললাম, ‘অপেক্ষা করো’ । তিনি মিনিটের মধ্যে ক্যাটারিনা চলে এলো । নিরহংকার, সদাহাস্য এই নারী কোনো কিছুতেই বিরক্ত হয় না ।

অপ্রশংস্ত গলি আর পুরোনো ভবন গামলাস্তানের বৈশিষ্ট্য মেন ইতিহাস বইয়ের একটি অধ্যয় । সবকিছু পুরোনো হলেও পরিচ্ছন্নতায় কর্মতি নেই । ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আর ছবি তুললাম । ঘন্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে যে জায়গাটায় এসে থামলাম, সেটি হচ্ছে সুইডিশ একাডেমি । অন্যান্য ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার নরওয়ে থেকে দেয়া হলেও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় এই সুইডিশ একাডেমি থেকে । পাশেই পার্লামেন্ট ভবন, একটু উঁচু জায়গায় । অনেক মানুষ এই এলাকায় বেড়াতে এসেছে বিকালে । হাঁটতে হাঁটতে আমরা ফোয়ো অফিসে চলে এসেছি । কিছুক্ষণ বিশ্রাম, আলাপচারিতা । তারপর ডিনার, সূর্য তোবার আগেই । ক্যাটারিনা আমাকে বললো, ‘তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আর একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম । কিছুক্ষণ বিশ্রাম আলাপচারিতা । তারপর ডিনার, সূর্য তোবার আগেই । ক্যাটারিনা আমাকে শহর দেখাতে বের হলো । গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আলকাহল টেস্ট দিলো । একটা পাইপ মুখে নিয়ে ফুঁ দিলো । এই টেস্টে কোয়ালিফাই না করলে গাড়ি স্টার্ট নেবে না । নেশগ্রস্ত অবস্থায় ড্রাইভিংয়ের বিরক্তে এই সর্তর্কতা । বড়সড় একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ড্রাইভ করে বিচ এলাকায় একটা পার্কে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম । ক্যাটারিনা আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো ওর মেয়েকে আনতে । আমি ওকে দাওয়াত দিলাম পরদিন ইত্তিয়ান রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার জন্য ।

বলা যায়, আজই সুইডেনে আমার শেষ দিন । আগামীকাল ডেনমার্কের উদ্দেশ্যে যাও । অন্যরা নানা দলে ভাগ হয়ে গেলেও আমি আলাদা যাচ্ছি । ডেনমার্কে ফারকুর মামার বাড়ি হয়ে যাবো বলে । ক্যাটারিনা এলো ১১টার দিকে । সেভেন ইলেভেন থেকে খাবার আনতে গিয়ে জেনেছিলাম, এখানে শান্তি নামে একটা ইত্তিয়ান চেইন রেস্টুরেন্ট রয়েছে । হোটেলের পেছনের রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে একটা নিচে নেমে নদীর পাড় দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলাম । চমৎকার জায়গা, চমৎকার পরিবেশ । মানবজন কেউ হাঁটছে, কেউ জিগিং বা সাইক্লিং করছে । সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা ব্রিজ পার হয়ে গুগল ম্যাপ অনুসরণ করে আমরা যেখানে পৌছালাম ওটা শুকরিয়া নামে একটা রেস্টুরেন্ট, শান্তি চেইনের আউটলেট । ভেতরে বসে জানতে পারলাম, মালিকের বাড়ি সিলেট । লক্ষনে যত ইত্তিয়ান রেস্টুরেন্টে থেয়েছি, সবগুলোর মালিক বাংলাদেশি । ইউরোপেও তারই চেই । ক্যাটারিনার পছন্দ মতো ভূনা খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস অর্ডার দিলাম । বাটি ভূরা মাংস, কিন্তু একটা কাপে খানিকটা রাইস দিলো, খিচুড়ি হিসেবে যা মানোভীর নয় । অবশ্য ক্যাটারিনা অনেক প্রশংসনা করলো খাবারের । প্রশংসন করা নিঃসন্দেহে ওদের একটা চারিত্রিক গুণ । লাঞ্চ শেষে আমরা গেলাম ন্যাশনাল মিউজিয়ামে । সুইডেনের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন, নিকট অতীতের কিছু প্রযুক্তি উপকরণ যেমন- টেলিফোন সেট, টাইপ মেশিন, অ্যাডিং মেশিন, সাইক্লোস্টাইল মেশিন ঘুরে



ସୁରେ ଦେଖିଲାମ, ଛବି ତଳାମ ।
ମୁଉଜିଯାମ ଥିକେ ବୈରିଯେ କାହେଇ ଏକଟା ଜେଟିତେ
ଗେଲାମ । ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାହାଜ ନୋଙ୍ଗ କରା । ଏସବ
ଜାହାଜ କରେ ଇଉରୋପେର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶେ ଭରଣ କରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟକରା । ଆମାର ସୁଇଡେନ ଭରଣେର ଏଥାନେଇ ହିତ ।
ଆଗମୀକାଳ ଥିକେ ଡେନମାର୍କେ ସଂକଷିପ୍ତ ସଫର ।
ଟେକହୋମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥିକେ କ୍ଷାଭିନେଭିଯାନ
ଏୟାରଲାଇନ୍ସେର ପ୍ଲେନେ ଢେଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଲାମ, ଗନ୍ତବ୍ୟ
ଡେନମାର୍କେର ବିଲୁନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ । ଏକଟୁ ପର ଏୟାର
ହୋପ୍ଟେସ ଏଲୋ ଏକଟା ପ୍ଲାକେସେର ଟ୍ରାନି ନିଯେ । ଚା ଛାଡ଼
ସବକିଛୁ ପଯ୍ୟା ଦିଯେ କିମତେ ହେବ । ଏକ ପ୍ଲାକେଟ
ବାଦାମ, ପାନି ଆର ଚା ନିଯେ ନଗଦ ଟାକା ଏଗିଯେ
ଦିଲାମ । କିନ୍ତୁ ନା । ବାର ପୋଷେ ଲେଗେ ବଳ ଫିରେ
ଏଲୋ । ନଗଦ ଚଲବେ ନା । କାର୍ଡ ଦିଯେ ପେ କରତେ ହେବ ।
ଇଉରୋପେ ଆସାର ପର ଥେକେଇ ଏହି ସମସ୍ୟା ଭୁଗଛି ।
କାର୍ଡ ନେଇ, ବଲେ ବାଦାମ ଆର ପାନି ଫିରିଯେ ଦିଲାମ ।
ପ୍ରାଣୀ ମାନ୍ୟଟାକେ ଦେଖେ ମେଯେଟାର ବୋଧ ହେବ ମାଯା
ହଲୋ । ଏକଟୁ ହେବେ ବିନା ପଯ୍ୟାସାୟ ଖାବାରଙ୍ଗଲୋ ଦିଯେ
ଚଲେ ଗେଲୋ । ଛୋଟ ଛିମଛାମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିଲୁନ୍ ।
୧୯୮୩ ସାଲେ ଏର ଚେୟେ ଛୋଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାଲ୍ଟାଯ
ଅବତରଣ କରେଛିଲାମ ନବସ୍ଥକୁ ନିଯେ । ତବେ
ତଥକାର ମାଲ୍ଟାର ଚେୟେ ଏହି ବିଲୁନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ
ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଆର ଗୋଛାନୋ ।
ପ୍ଲେନ ଥିକେ ନାମାର ପାଂଚ- ସାତ ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟାଗ
ପେଯେ ଗେଲାମ । ଶେନ୍ଫେନ ଭିସା । ତାଇ ଇମିଶ୍ରଣ ବା
କାସ୍ଟମ୍ସେର କୋନୋ ବାଲାଇ ନେଇ । ବେର ହେୟେଇ ଦେଖି
ଫାର୍କକ ମାମା ଆର ମାମି (ହ୍ୟାନେ) ଦାଢ଼ିଯେ । ଏହି
ମାମିକେ ଆମି ବାଙ୍ଗାଦେଶେ ଦେଖେଛି କରେକବାର ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ଆର ମେହିଯାରୀ, ବାଙ୍ଗଲି ନାରୀର
ମତୋଇ । ଫାର୍କକ ମାମା ଆମାର ଆଶ୍ରାମ ମାତୋ ଭାଇ,
ବସେ ଆମାର ଚେୟେ ଦୁଇ ତିନ ବର୍ଷରେର ବଡ଼ । ୧୯୭୩
ସାଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଡ଼ା ଶେଷ ନା କରେଇ ଚଲେ
ଏସେହେନ ଡେନମାର୍କେ । ସେଇ ଥିକେ ଜୀବିକା, ବିଯେ,
ସଂସାର, ଜୀବନ ଧାରନ ଏଥାନେଇ ।

ଗାଡ଼ିତେ ମାମାର ପାଶେ ଆମି ବସିଲାମ । ମାମି ପେହନେ ।
କିଛୁ ଦୂର ଯା ଓୟାର ପର ଆମି ବଲାମା, 'କ୍ୟାଟାରିନା
ଗତକାଳ ଆମାକେ ବଲେହେ ବିଲୁନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟର
କାହେଇ ନାକି ଲେଗେ ଲ୍ୟାନ୍' । ମାମା ସାଥେ ସାଥେ ଗାଡ଼ି
ସୁରିଯେ ଅନ୍ୟଦିକେ ରଣା ଦିଲେନ । ଏଥନ୍ତି ଦେଖେ ଯେତେ
ହେବ । ପରେ ସମୟ ହେବ ନା । ଲେଗେ ଲ୍ୟାନ୍ ବେଶିକଣ
ଥାକତେ ପାରିନି । କାରଣ, ଏଟା ମାମାର ପ୍ଲାନେର
ବାହିରେ । କିଛକଣ ଘୋରାଘୁରି, ଛବି ଉଠାନୋ, ତାରପର

ଆବାର ରଣା । ଏକଟା ବିଚେ ଗିଯେ ଥାମଲାମ ।
ଜାୟଗାଟାର ନାମ 'ଭିଡ଼ ସ୍ୟାନଡେ' ବା white sand.
ଏକଟା ଉଇଭମିଲ ଟାଓୟାର ରଯେଛେ ଓଥାନେ । ଜ୍ଞାନାନିର
ସବୁଜାଯାନେ ଅନେକ ଏଗିଯେହେ ଡେନମାର୍କ । ଉଇଭମିଲ
ଆର ସୋଲାର ଏନାର୍ଜିର ବାବହାର ଦିନ ଦିନଇ ବାଢ଼ିଛେ ।
ମାମି ଖାବାର ନିଯେ ଏସେହେନ ବର୍ଜେ କରେ । ସାଥେ ଚାଦର,
ପ୍ଲେଟ, ଚାମଚ । ପ୍ରଚୁର ବାତାମ । କାଶବନେର ମତୋ ଏକଟା
ଜାୟଗାୟ ଚାଦର ବିଛିଯେ ଲାଞ୍ଚ କରିଲାମ । ଖାବାରେ ମାମିର
ବେଜେ ଓଠେ । ଏକ କୋଣାଯ ରଯେଛେ ଶିଶୁଦେର ଏକଟି
ଫ୍ଲୋର୍ରୁଟ ।

ବାଙ୍ଗଲିର ମାମା ବାଡ଼ିର ଆବଦାର ଅନେକଟା
ଆଧିକାର ବଲେଇ ବିବେଚିତ ହେବ । ଏହି
ବିଦେଶ-ବିଭୁଲ୍ଲିଯେ କଦିନ ମାମା-ମାମିର
କାହ ଥିକେ ଯେ ଆଦର ଆପ୍ୟାୟନ
ପେଯେଛି, ଏକ କଥାଯ ତା ଅସାଧାରଣ । ଆମି ନିଶ୍ଚିତ,
ବାଙ୍ଗଲି ମାମି ହଲେଓ ଏର ଚେୟେ ବେଶ ଆନ୍ତରିକତା
ପେତାମ ନା । ଆମି ଆସୁତ ହେୟେଛି ସେଦିନ, ଯେଦିନ
ଦେଖିଲାମ- ମାମି ନିଜ ହାତେ ବେକ କରା
ବିକ୍ଷୁଟ ଏକଟା ବେଙ୍ଗ ବେତ୍ରେ ସାଥେ ପ୍ୟାକ
କରେ ଦିଲେନ ଆମାର ପରିବାରେର ଜଣ୍ୟ ।
ଆମି ନତୁନ କରେ ଉପଲକ୍ଷ କରିଲାମ,
ଭାଲୋବାସା କୋନୋ ମାନଚିତ୍ର, ସୀମାନ୍ତ,
ଜାତୀୟତା, ସଂକ୍ଷିତିର ବିଭେଦ ମାନେ ନା ।
ଭାଲୋବାସାର ଶକ୍ତି ଅପରିସୀମ

ଯେତେର ଛୋଟା ।
ଡେନମାର୍କେ ଆମାର ତିନିଦିନେର ଘୋରାଫେରା ମାମାର
ପରିକଳନା ମତୋ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅବସଥା west bay-
ତେ ମାମାର ସାମାର ରିସୋଟେ । ଜ୍ଞାଲେର ମତୋ ଏକଟା
ଜାୟଗାୟ ଏକଟା ଘର । ଏକଟୁ ଦୂରେ ଦୂରେ ଆରଓ କିଛୁ
ଘର । ଗାଡ଼ି ବାଇରେଇ ରାଖା ହେବ । ରାତରେ ଖାବାର ହଲୋ
ଏକବାରେ ମନେର ମତୋ- ପରୋଟା, ଗରମ ମାଂସ, ଭାତ ।
ରାନ୍ଧା ଓ ଗେରଶାଲି କାଜେ ମାମା ଖୁବଇ ପାରଦର୍ଶୀ ।
ପରଦିନ ଥର୍ମ ମିନେ ନାମକ ଏକଟା ଜାୟଗାୟ ମାହେର
ଆଢ଼ତ ଦେଖିତେ ଗେଲାମ । ଶେଷ ଦେଯା ବଡ଼ ଏକଟା
ଜାୟଗାୟ । ମାଛ କେନାବେଚା, ପ୍ରସେସିଂ, ପ୍ର୍ୟାକେଜିଂ ସବ
କିଛିରଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥାନେ । ପାଶେଇ ବାଲ୍ଟିକ ସାଗର ।
ପାଥୁରେ ସୈକତ ଧରେ ହାଁଟାହାଁଟି କରିଲାମ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାମାର ଶହରେର ବାଡି ସିଙ୍କେବୋର୍ଗ ।
ଶହରେର କୋଲାହଳ ଅବଶ୍ୟ ଏଥାନେ ନେଇ । ନିରିବିଲ
ସୁନ୍ଦର ଏକତଳା ବାଡି, ଆଧୁନିକ ସବ ସୁଯୋଗ
ସୁବିଧାସହ । ବାଡିର ପେଛନେ ଏକଟୁ ଜ୍ଞାଲ, ଦୁ-ତିନଟା
ହରିଗେର ଆବାସ । ମାରେ ମାରେ ବେରିଯେ ଆସେ ।

ଖରଗୋଶେର ଆନଗୋନାଓ ରଯେଛେ । ବାଡିର ସାମନେ
ସୁନ୍ଦର ଲନ । ସ୍କାର୍ଟ ଏକଟା ଘାସ କାଟାର (mower) ଯନ୍ତ୍ର
ଆହେ । ସନ୍ତୁଷ୍ଟାହେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟେ ଲନେର
ଘାସ ଛେଟେ ଦେଯ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି । କବେ, କଥମ, କଟୁକୁ
ଛାଟିତେ ହେବ- ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ଦେଯା ଆହେ । କୋନୋ
ମ୍ୟାନ୍ୟାଲ ବା ରିମୋଟ କନ୍ଟ୍ରାଲେର ଦରକାର ପଡ଼େ ନା ।
ସମୟ ଶେଷେ ଓର ନିର୍ଧାରିତ ଘରେ ଗିଯେ ଆଶ୍ୟ ନେଇ ।
ବାଡିତେ କେଉଁ ନା ଥାକଲେଓ ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନ
କରେ ।

ସିଙ୍କେବୋର୍ଗ ଦୁଦିନ ଅବସ୍ଥାନେର ସମୟ କହେବିଟି ଜାୟଗାୟ
ଗିଯେଛି । ଏର ମାରେ ଉଲ୍ଲେଖିଯୋଗ ହଲୋ- ଏକଟା san-
itorium ପରିଦର୍ଶନ, ଯା ଯୁକ୍ତର ସମୟ ଛିଲ ଏକଟି
ଦୂର୍ଘ । ଏଥାନେ ଚମକାର ଏକଟି ବାରନା ଧାରା ଆର ଏକଟି
ପାର୍କ ରଯେଛେ । ଏକ ଜାୟଗାୟ ଏକଟି କାଠେର ଟେବିଲେର
ମତୋ- ଓତେ ସାତ ସୁର ଟିଉନ କରା । ପାଶେ ଟିକ୍ ରାଖା
ଆହେ । ଟେବିଲେ ଆଖାତ କରିଲେ ସା ରେ ଗା ମା ସୁର
ବେଜେ ଓଠେ । ଏକ କୋଣାଯ ରଯେଛେ ଶିଶୁଦେର ଏକଟି
ଫ୍ଲୋର୍ରୁଟ ।

ବାଙ୍ଗଲିର ମାମା ବାଡ଼ିର ଆବଦାର ଅନେକଟା
ଆଧିକାର ବଲେଇ ବିବେଚିତ ହେବ । ଏହି ବିଦେଶ-ବିଭୁଲ୍ଲିଯେ କଦିନ
ମାମା-ମାମିର କାହ ଥିକେ ଯେ ଆଦର ଆପ୍ୟାୟନ
ପେଯେଛି, ଏକ କଥାଯ ତା ଅସାଧାରଣ । ଆମି ନିଶ୍ଚିତ,
ବାଙ୍ଗଲି ମାମି ହଲେଓ ଏର ଚେୟେ ବେଶ ଆନ୍ତରିକତା
ପେତାମ । ଆମାକେ ଏଯାରପୋର୍ଟେ ପୌଛେ ଦିଲାମ,
ପରିକଳନାୟ । ଆମାକେ ଏଯାରପୋର୍ଟେ ପୌଛେ ଦିଲାମ । ମାରେ
ଏକ ଜାୟଗାୟ ଥାମଲାମ । ଖାବାର ନିଯେ ସାଗର ପାଦେ
ଏକଟା ବେଞ୍ଚିତେ ବସିଲାମ । ମାଥାୟ ଚୁଲ ସଂକଟେର କାରଣେ ଦେଶେ ଓ
ଶୀତେର ଦିନେ କ୍ୟାପ ବା ହ୍ୟାଟ ପରତେ ହେବ । ଆର ଏଥାନେ
ତୋ ଏଟା ଆର ଓ ପ୍ରାସିକ । ସାଗରେ ପଡ଼ାର ଆଗେଇ
ଦୌଡ଼େ ଗିଲେ ହ୍ୟାଟ କୁଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଏଲାମ । ଏଥାନେ ଥେକେ
ଏକଟି ୧୮ କିଲୋମିଟାର ଲଞ୍ଚ ସେତୁ ପାଇଁ ଦିଲାମ । ଏଟା ଛିଲ ବିଶ୍ୱେର
ଦୀର୍ଘତମ ସେତ ।

ଏର ରେଲ ଅଂଶଟୁକ ମାବାମାର ଗିଯେ ସାଗରର ନିଚେ
ଢୁକେ ପଡ଼େହେ । ଓପରେ ଗିଯେ ଡାଙ୍ଗ୍ୟ ଉଠିଛେ ।
କୋପେନହେଗେନ ଏୟାରପୋର୍ଟେ ପୌଛେଓ ମାମା ଆମାକେ
ଏକା ଛାଡ଼ିଲେନ ନା । ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରେ ଚେକ-ଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆମାର ସାଥେ ରାଇଲେନ । ଯେନ ଆମି ଗ୍ରାମ ଥିକେ ଡାକାଯ
ବେଡାତେ ଆସ ଆତ୍ମୀୟ । ମାମା-ମାମିକେ ବିଦ୍ୟା ଜାନିଲେ
ଡିପାର୍ଚାର ଲାଉଞ୍ଜେ ଗିଯେ ବସିଲାମ । ଦୁବାଇ ହେୟେ ଦେଶେ
ଫିରିବେ । ଅନେକ ଦିନ ପର ଏକଟୁ ଲଞ୍ଚ ସମୟ ବିଦେଶେ
କାଟାଲାମ । ଦେଶେ ଫେରାର ଖୁଶି ଅନୁଭବ କରତେ ଶୁରୁ
କରେଛି । ଇନହାନ୍ତ ଓୟାତାନାମ ।

ଲେଖକ: କବି ଓ ଅନୁବାଦକ ◆



লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-সোফিয়া লরেন-গারিবণ্ডির দেশে

কল্প
ন
ত
ন
গ

■ আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল
রঙে-রঙে ভ'রে আছে মানুষের মন
রোম নষ্ট হয়ে গেছে... গেছে বেবিলন
পৃথিবীর সব গল্প কাটের মতন। (জীবনানন্দ দাশ)
গ্রিস থেকে এগিয়ে চললাম ইতালির উদ্দেশে।
গ্রিসের পাতাস থেকে জাহাজ ছাঢ়ল ইতালির
আনন্দকোনার উদ্দেশে। পৌছতে সময় লাগল ২০
ঘণ্টা। ভাড়া নিল ১৫,৮০০ ড্রাকমা। গ্রিসের মুদ্রার
নাম ড্রাকমা। ১ ইউএস ডলার সমান ২৬৮ ড্রাকমা।
জাহাজের নাম স্পারফাস্ট-১। জাহাজের নিচে
সাইকেল রেখেছিলাম। সাইকেল এলো বিনাভাড়ায়।
মোটরবাইক, গাড়িও এলো অনেক, কিন্তু অতিরিক্ত
পয়সা গুগতে হলো এগলোর স্বত্ত্বাধিকারীদের।
জাহাজটি খুবই বিশাল আকৃতিঃ; প্রায় ১৪০০ যাত্রীর
ধারণক্ষমতা। জাহাজের ভেতর ক্যাসিনো, বার,
ডিসকো, রেস্টুরেন্ট, ডিউটি ফ্রি শপ, সুইমিং পুল
ইত্যাদি রয়েছে। যাত্রীসেবার জন্য জাহাজটিতে ১০৬
জন কর্মচারী নিয়োজিত। জাহাজে পরিচয় হলো
তিন সদস্যের একটি অস্ট্রেলিয়ান ট্যুরিস্ট গ্রুপের,
এক জার্মান দম্পত্তি ও আরও অনেকের সাথে। খুব
ইচ্ছে হচ্ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করি।
ইঞ্জিন রুম দেখার পর পরিচয় দিতেই তার ব্যবস্থা
হলো।
বিকালে আনন্দকোনা এসে পৌছলাম এবং
ইমিশেশনের খপ্পডে পড়ে আমাকে দীর্ঘ সময়
অপেক্ষা করতে হলো। ইমিশেশন কীভাবে ফেস
করতে হয়, কিউটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই গ্রিসের
সংবাদপত্রে আমার নিউজটি দেখলাম এবং সেই
সাথে ইতালির গ্রেটিস ভিসাও। আর তাতেই কাজ
হলো। তাদের কাছ থেকে কিছু তথ্য নিয়ে
সাইকেলে পা রাখলাম। সাইকেল চালাচ্ছি আর
সমুদ্রকে দেখছি। পথে অনেক হিপ্পি দেখলাম, সেই
সাথে কিছু বারবনিতার আনাগোনা লক্ষ্য করলাম।
বন্দরে বারবনিতাদের সমাগম সর্বত্রই। একটি

তিনি বললেন- ‘সামনেই পিয়াচ্চা
ভিস্টোরিয়া বলে একটা জায়গা আছে,
সেখানে প্রচুর বাঙালি থাকেন’। তিনি
আমাকে কিছু খুচরা পয়সা দিলেন
টেলিফোন করার জন্য। সাইকেল নিয়ে
সব এলাকা চমে বেড়ালাম। কিন্তু এত
রাতে কারও দেখা পেলাম না।
এদিকে প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্থ।
প্রস্তাবের বেগ অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে।
কিন্তু এই রোমে কোথায় হালকা হই?
চারদিকে কোনো জায়গা দেখলাম না,
যে জায়গায় চুপিচুপি হলেও কাজটা
সারা যায়। টেলিফোন বুথে গেলাম,
কিন্তু সেটাতে পয়সা দিয়ে কাজ হয়
না। সেটা ছিল কার্ডফোন সিস্টেম।
ক্ষুধা লেগেছে, আবার প্রস্তাবেরও চাপ।
অসহ্য বিরক্তিকর। রাগ করে
টেলিফোন বুথের সাথে সাইকেলে
ব্যাগ রেখেই খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ কিছু
গাছ দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম এবং হৃষ শান্তি...।
সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন বাসার সামনে বেজারে নাম
দেখতে থাকলাম। যাই কোনো বাঙালির সন্ধান
পাই। এভাবে অনেকক্ষণ পর ব্যর্থ হয়ে ভাবলাম,
স্লিপিং ব্যাগ তো সাথে আছেই, কোনো সমস্যা
নেই। সাবওয়ের কাছে এসে টেলিফোন বুথের
সামনে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সেই বুথটি ও কার্ডফোন
সিস্টেম। হঠাৎ এক বাঙালিকে এগিয়ে আসতে দেখে
বললাম- আমার কাছে কিছু কয়েন আছে, তবে
টেলিফোন বুথটি শুধু ফোনকার্ড চলে। তাই
অনুরোধ করলাম তার কাছে যদি ফোনকার্ড থাকে,
তাহলে আমাকে যেন একটি কল করার সুযোগ
দেন। টেলিফোন নন্দি নিয়ে ডায়াল করে আমাকে

ফাস্টফুডের দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিলাম এবং
আবারও প্যাডেলে পা চাপলাম- গন্তব্য রোম।
রোমের টারমিনি স্টেশনে পৌছলাম। টারমিনি হচ্ছে
ইউরোপের সবচেয়ে বড় ও ব্যস্ততম রেলওয়ে
স্টেশন। এই এলাকায়ই নাকি প্রচুর বাংলাদেশি
থাকেন। কিন্তু রাত ১১টার সময় কোথায় তাদের
দেখা পাই! হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক বাংলাদেশির

লিটু ভাইয়ের বাসায় গেলাম।
সাইকেলটাকে ওপরে নিয়ে আসতে
হলো। রোমে সাইকেল চোরের উপদ্রব
আছে। একটা অ্যাপার্টমেন্টে ১৮ জন
বাঙালি একত্রে থাকেন। আমাকে হাত-
মুখ ধূয়ে খেতে বললেন। রোমের
প্রথম ভাত লিটু ভাইয়ের ওখানে
খেলাম। সবাই ঘিরে ধরল। সাইকেলে
বিশ্বভ্রমণ! অবাক হলেন, সাহসিকতার
প্রশংসা করলেন। সবার নাম মনে
নেই। কিন্তু মনের পর্দায় তাদের সে
মুখ কখনো ভুলবার নয়। রিপন ও লিটু
দুজনে টেলিফোনের ব্যবসা করতেন।
তারা সবাই ছিলেন শরীয়তপুরোর।
ইতালিতে প্রচুর শরীয়তপুর,
ফরিদপুরের লোক। লিটু ভাইয়ের
মাধ্যমে অনেক বাঙালির সাথে পরিচিত
হলাম। এবং আমার অনেক পরিচিত
মানুষ পেয়ে গেলাম। যাদের সান্নিধ্যে
রোমের দিনগুলো হেসে-খেলে,
আনন্দ-ফুর্তিতে কেটে গিয়েছিল



আমাকে আশ্বস্ত করলেন, আপনার আর কোনো
অসুবিধা হবে না।

লিটু খুব ভালো ছেলে। এই রাসু ভাইয়ের কাছে
প্রায়ই যেতাম। তিনি রোমে একমাত্র বাঙালি
নাপিত। রাসু ভাই জানালেন- তার প্রবাস জীবনের
প্রথম দিনগুলো ছিল অনেক কঠরে। তিনি যখন
রোমানিয়ায় ছিলেন তখন তার কাছে কোনো ঠিকানা
ছিল না। কোথায় যাবেন? তো যখন পৌঁছলেন,
তখন ছিল রাত এবং প্রচণ্ড শীত। বরফ পড়ছিল।
এক বাসায় আশ্রয় চাইলে তারা কিছু পয়সা দিয়েছিল
খাবারের জন্য। কিন্তু নতুন আগস্টককে আশ্রয় দিতে
সাহস পাননি। সেই স্থৃত মনে করে বললেন- ‘ভাই
আজও ভুলতে পারিনি জীবনের সেই সব দুর্বিহাহ
কথা। প্রবাস মানেই যে কী কষ্ট, কী যে মনের
টানাপোড়েন বুবাতে পারবেন কোথাও থাকলে এ
যেন এক নির্বাসিত জীবন। বন্দি ভাগ্যের কারাগারে।
সুন্দর জীবন, মধুর স্বপ্ন সবই নিষ্পেষিত বাস্তবের
যাতাকলে’।

লিটু ভাইয়ের বাসায় গেলাম। সাইকেলটাকে ওপরে
নিয়ে আসতে হলো। রোমে সাইকেল চোরের
উপদ্রব আছে। একটা অ্যাপার্টমেন্টে ১৮ জন বাঙালি
একত্রে থাকেন। আমাকে হাত-মুখ ধূয়ে খেতে

বললেন। রোমের প্রথম ভাত লিটু ভাইয়ের ওখানে
খেলাম। সবাই ঘিরে ধরল। সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ!
অবাক হলেন, সাহসিকতার প্রশংসা করলেন। সবার
নাম মনে নেই। কিন্তু মনের পর্দায় তাদের সে মুখ
কখনো ভুলবার নয়। রিপন ও লিটু দুজনে
টেলিফোনের ব্যবসা করতেন। তারা সবাই ছিলেন
শরীয়তপুরোর। ইতালিতে প্রচুর শরীয়তপুর,
ফরিদপুরের লোক। লিটু ভাইয়ের মাধ্যমে অনেক
বাঙালির সাথে পরিচিত হলাম। এবং আমার অনেক
পরিচিত মানুষ পেয়ে গেলাম। যাদের সান্নিধ্যে
রোমের দিনগুলো হেসে-খেলে, আনন্দ-ফুর্তিতে
কেটে গিয়েছিল। সবাই বিশেষ করে রাসু ভাই তো
আমাকে থেকে যেতে বলতেন প্রতিদিনই। রাজু,
মিজান এবং আগে প্যারিসে ঢাকা ক্লাবের সাথে
সম্পৃক্ত ছিলেন। প্যারিসে কাজ না হওয়ায় তারা
অনেকে ইতালিতে চলে এসেছেন। আমাকে নিয়ে
রাজু ভাইয়ের ব্যক্তিতার অন্ত ছিল না। তারা আমাকে
নিয়ে একেক দিন একেক বাসায় পার্টি দিতেন।
বিরাট আঙ্গ হতো। সত্যিই বড় সূর্যে দিন
কাটাচ্ছিলাম ওদের সঙ্গ পেয়ে। লিটু ভাই আমাকে
প্যান্ট, জ্যাকেট উপহার দিলেন। বন্দি সবুজের সাথে
হঠাতে করে দীর্ঘ ৪/৫ বছর পরে দেখা হলো রোমের



রাস্তায়। বন্ধুকে দেখেই জড়িয়ে থরে সৌহার্দ্য বিনময় হলো এবং দীর্ঘ সময় যোগাযোগ না করার জন্য গালমন্দ করলাম। সবুজ জোড় করেই তার বাসায় নিয়ে গেল। চারজন একটি বাসায় থাকে। অ-নে-ক দিন পর পুরোনো বন্ধুকে পেয়ে স্মৃতিচারণ করতে লাগলাম। ভোর টেটার সময় সবুজ কাজে চলে গেল এবং বাসায় ফিরবে সক্ষ্য খটায়। সন্ধিতে শেষ দিন একটি দোকানে সে কাজ করছে। কী ভীষণ ব্যস্ত। তাকে নিয়ে কোথাও একদিন ঘুরতে পারলাম না। অথচ কী কষ্ট করছে সে এখানে, দেখে আবাক হলাম। কারণ সে দেশে থাকতে খুবই সৌখিন ও আরামপ্রিয় ছিল। টাকা পয়সার কোনো অভাব ছিল না তার। সেই সবুজ এখানে কী পরিশুম করছে, ভাবতেই কেমন লাগে! এটাই জীবন এবং এটাই বাস্তবতা।

জুলিয়াস সিজার, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, হিটলারের মিত্র মুসোলিনি, সোফিয়া লরেন, গ্যারিবাল্ডি, দারিও ফোর দেশ ইতালি। রাজধানী রোম। কিন্তু ইতালিয়ানীর বলে রোম। রোম ইতালির প্রায় মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত। রোম ইতালির ল্যাংগিশও অঞ্চলের একটি প্রদেশ। আয়তন ৩০৫২ বর্গ কিলোমিটার। পানি ও স্তলপথে রোম ইতালির কেন্দ্রবিন্দু। ইতালি একটি পেনিনসুলা, যার বাংলা অর্থ উপর্যুক্তি। ইতালি বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার দেশ। সুন্দর অতীত থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, চিত্রকলা, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভূবনকে ইতালি অনেক কিছু দিয়েছে। দাক্ষে, পেত্রার্ক, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, বেনিটো মুসোলিনি, গ্যারিবাল্ডি কতই না বিখ্যাত ব্যক্তির দেশ এই ইতালি। ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ এই রোমেই অবস্থিত এবং এই মসজিদ তৈরিতে বাংলাদেশ সরকারও অর্থ দিয়েছে। একদিন নামাজ পড়তে গেলাম। সত্যিই প্রকাণ বড় এবং সুন্দর এই মসজিদ। মসজিদের সামনে চলন্ত খাবারের দোকান থেকে কিছু খেলাম। তারপর ঘুরতে বের হলাম। রোমে বেড়ানোয় খুব মজা আছে। চারদিকে অজ্ঞ টুরিস্টের সমাগম। সেজন্যাই বোধহয় রাস্তায় ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু-কিছু রাস্তা-ঘাট মার্বেল পাথরের তৈরি। সাইকেল চালাতে কিছুটা কষ্ট হলেও বেশ আনন্দ পেতাম। রাস্তায় লোকজনের চলাফেরাও ছিল বেশ মজাদার। প্রায়ই ছেলেদের দেখতাম তারা খুব সুন্দর শিশ বাজাচ্ছে। এবং মেয়েরা তো অস্তর বিপদ্জনক' সুন্দরী, প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে।

টারমিনি ইউরোপের সবচেয়ে ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন। এখান থেকে ইউরোপের সব দেশেই যাওয়া যায়। 'সিটিএস' নামে একটি সংগঠন আছে যাদের রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি এবং এটিই সবচেয়ে বড় ট্রান্সেল অবগানাইজেশন। সেখানকার ছাত্রদের তারা ডিস্কাউন্ট দিয়ে থাকে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে। রোমের কিছু ইয়ুথ অবগানাইজেশনের সাথে যোগাযোগ হলো এবং বেশ আপ্যায়িত হলাম। ভ্যাটিকানে পৌঁছে দেখলাম সেখানে অস্তর ভিড়। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ হিসেবে এর পরিচয় রয়েছে। আয়তন মাত্র শুন্য দশশিক ৪৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯২৯ সালে পোপের প্রতিনিধি ও বেনিটো মুসোলিনির মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে ভ্যাটিকান সিটি সার্বভৌমত্ব লাভ করে। যদিও ভ্যাটিকান রোমের মধ্যে অবস্থিত। মাহামান্য পোপ এই রাজ্যের রাজা। ভ্যাটিকানের নিরাপত্তারক্ষীরা ইতালিয়া নয়, সুইস সৈনিক। সুইজারল্যান্ড নিরেপক্ষ দেশ বলে এই ব্যবস্থা। ছবি তুললাম এবং দাঁড়িয়ে গাইডের পরিবর্তনের মনোরম দৃশ্য দেখলাম।

ভ্যাটিকানে পৌঁছে দেখলাম সেখানে অস্তর ভিড়। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ হিসেবে এর পরিচয় রয়েছে। আয়তন মাত্র শুন্য দশশিক ৪৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯২৯ সালে পোপের প্রতিনিধি ও বেনিটো মুসোলিনির মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে ভ্যাটিকান সিটি সার্বভৌমত্ব লাভ করে। যদিও ভ্যাটিকান রোমের মধ্যে অবস্থিত। মাহামান্য পোপ এই রাজ্যের রাজা। ভ্যাটিকানের নিরাপত্তারক্ষীরা ইতালিয়া নয়, সুইস সৈনিক। সুইজারল্যান্ড নিরেপক্ষ দেশ বলে এই ব্যবস্থা।

বসানো রাস্তা পৃথিবীর অন্যত্র তেমন নেই। ৬২৬ বছর ধরে ভ্যাটিকান সিটি পোপের বাসস্থান। ১৩৭৭ সাল থেকে প্রায় ২৬০ জন পোপ সেন্ট পিটারের সিংহাসনে বসেছেন। ভ্যাটিকানের ইতিহাস প্রেম ও ক্ষমার ইতিহাস। বিশ্বাত্মক ইতিহাস। তাই আজও ভ্যাটিকান অক্ষয় ও অব্যয়, মানব ইতিহাসের পৃণ্যত্বম। রোমের আলিয়ঁস ফ্রেসেজে যাই এবং পরিচিত হই Madam Anne Marie Roquetti এর সাথে। গ্রিসের আলিয়সের গণী উচ্চ আমাকে একটি চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন। আলিয়ঁসের চিঠি দেখে তিনি আমাকে ওখানকার কিছু লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং জানতে চাইলেন আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কিনা? বাঙালি ভাইদের আতিথেতা গ্রহণ করেছি বলে জানালাম। তারা আমার জন্য অলিপিক কমিটি, কিছু স্কুল, ফরাসি দূতাবাসে আমার ভিসার জন্য যোগাযোগ করল। অন্ত মহিলা জানতে চাইলেন- আমার কোনো টাকা-পয়সা লাগবে কিনা। যদি লাগে, তবে তারা প্যারিস থেকে আনানোর ব্যবস্থা করবেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বেলাম, টাকা-পয়সার দরকার নেই; আমার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তবে আপনার এই সহযোগিতা



কিন্তু পোপ সব সময় জনসাধারণের সামনে আসেন না। একটি নির্দিষ্ট সময় তিনি আসেন। এই প্রথম একটি দেশে গেলাম, যেখানে কোনো ইমিশ্রেশন, কাস্টমস নেই। পাসপোর্টে সিল মারার কাজ নেই। রোম থেকে সবাই ভ্যাটিকানে যেতে পারেন। ভ্যাটিকানের জন্য আলাদা কোনো ভিসার প্রয়োজন নেই। ইতালির ভিসা বা সেনজেনের ভিসা থাকলেই হয়। প্রথ্যায় শিল্পী ও স্পতিনদীর বালিনে তৈরি ক্ষোয়ারটি দেখলাম। এরা বলেন কলোনেড। খুবই সুন্দর ও বিশাল অঙ্গ। ক্ষোয়ারটির তিনটি অংশ। তোরণ পেরিয়ে গেলেই বেশ বড় একফলি আয়তক্ষেত্রের প্রাঙ্গণ, তারপর সুবিশাল গোলাকার অঙ্গন। অবশেষে আবার একফলি আয়তক্ষেত্রাকার আঙ্গন, একেবারে সেন্ট পিটারের সোপান পর্যন্ত প্রসারিত। পুরো ক্ষোয়ারটি পাথর বাঁধানো। মগ ও উজ্জ্বল পাথর, বাকবাকে তক্তকে। রোমের মতো এমন পাথর

আমাকে অনেক এগিয়ে দেবে। মাদমোয়াজেল আমাকে একটি গাড়ি দিয়েছিলেন রোম ধোরার জন্য। আমি বেলাম, আমার তো সাইকেল আছে। তবুও এক প্রকার জোর করে একদিনের জন্য নিয়ে ঘুরতে বেরলেন। অগত্যা সাইকেলটি গাড়ির পেছনে নিয়ে গাড়িতেই ঘুরলাম। কিছু ফরাসি স্কুলে গেলাম, পরিচিত হলাম ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এবং আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য তলে ধরলাম তাদের কাছে। ফরাসি দূতাবাসে গেলাম ভিসার জন্য। তারা আমার কাছে ভিসা ফি চাইল। আলিয়ঁস ফ্রেসেজ আমাকে স্পসর করেছে, আর তোমরাই ভিসা ফি চাইছ, এটা তো ঠিক নয়। আমি তোমাদের কাছে ভিসা ফি দিয়ে ভিসা নিতে রাজি নই। এটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। তাই চলে এলাম। বেরক্তেই দেখি লিংকনকে। লিংকন, বাংলাদেশ যুব পর্যটক ক্লাবের সদস্য এবং ১৯৯৬ সনে বিশ্ব ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয় একাকি। ফরাসি দূতাবাসের সামনে সুন্দর একটি



ଫୋଯାରା ଛିଲ । ସେଖାନେଇ ଛବି ତୁଳାମ । ସେଓ ଫ୍ରାଙ୍କେ ଭିସାର ଜନ୍ୟ ଏସେଛ । ସେ ଆମାକେ ଜାନାଲ, ପରରାଷ୍ଟ୍ର ମହାଗାଲେର ଆହମେଦ ଆକତାରଜାମାନ, ଯିନି ଆମାଦେର ସାଇକେଳେ ବିଶ୍ୱ ଭରମଣେର ଜନ୍ୟ ଦାକା ଥେକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାଣୀ ଦିଯେଛିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ରୋମେ ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତବାସେ ଆଛେନ । ଲିଙ୍କନ ବଲଳ- ଇତାଲିତେ ଏଲେ ଆମ ଯେଣ ତାର ସାଥେ ଦେଖା କରି । ଏମନିଟେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତବାସେ ଯେତେ ମନ ଚାଯ ନା । ନାନା କାରଣେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ଦୂତବାସେର ଲୋକେରା । ତବେ ରେଫାରେପ ଥାକଳେ ବେଶ କାଜ ହୁଏ । ଆକତାରଜାମାନ ସାହେବେର କାହେ ଯାଇ । ତିନି ଆମାକେ ବଲଳେନ- କତଦିନ ହଲେ ଏସେଛ । ଚାର/ପାଂଚ ଦିନ । ତିନି ବଲଳେନ- ଏତଦିନ ହଲେ ଆର ତୁମି ବାଂଲାଦେଶେ ଦୂତବାସେ ଏଲେ ନା । ତାକେ ବୁଝିଆୟେ ବଲଳାମ, ଦୂତବାସେ ଆସତେ ତୋ ମନ ଚାଯ କିନ୍ତୁ ନାନା କାରଣେ (ତୁରକ୍ଷେର ଆଂକାରାୟ ଦୂତବାସେର ଅଭିଜତାର କଥା ବଲଳାମ) ଆସତେ ଇଛେ କରେ ନା । ଆମାର କଥା ତିନି ବୁଝିଲେନ । ଦେଖୋ, ସବାଇ ଯେ ଏକ ବକମ ହେବ, ତାର କୀ ନିଶ୍ଚଯତା । ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ ମିଲିଯେଇ ମାନୁଷ । ତୁମି ଏସେଛ, ଆମି ଖୁବ ଖୁଶି ହେଁଛି । ବଲୋ, ତୋମାର ଜନ୍ୟ କୀ କରତେ ପାରି? ଆମି କିଛୁ ଦେଶରେ ଭିସାର ଜନ୍ୟ ନୋଟ ଭାବରେଲ ଚାଇଲାମ । ତିନି ଜନାତେ ଚାଇଲେନ, କୋନ କୋନ ଦେଖ? ତାରପର ତିନି ଆମାକେ ନେଦାରଲ୍ୟାନ୍ଡ, ସୁଇଡେନ, ଫିନଲ୍ୟାନ୍ଡରେ ଭିସାର ଜନ୍ୟ ଚିଠି ଦିଲେନ । ନେଦାରଲ୍ୟାନ୍ଡ ପାଂଚ ମିନିଟେଇ 'Gratis' ଭିସା ଦିଲ । ତାରପର ସୁଇଡେନରେ ଓ ଭିସା ଦିଯେ ଦିଲ । ଶୁଦ୍ଧ ଫିନଲ୍ୟାନ୍ଡ ବଲଳ ଦୁଇ ସଞ୍ଚାହ ସମୟ ଲାଗିବେ । ଆମି ଅନୁରୋଧ କରଲାମ । ତାର ଆଲିୟାନ୍ସେର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେ ଆମାର ସାମନେଇ ଫିନଲ୍ୟାନ୍ଡ ଫୋନ କରେ ଅବହିତ ହେଁବ ବଲଳେନ, ଏକଦିନ ପରେ ଏସେ ପାସପୋର୍ଟ ନିଯେ ଯାନ ।

ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତବାସ, ଆଲିୟାନ୍ସ ଫ୍ରାଙ୍କେଜେର ଚିଠି, ବିଦେଶ ପତ୍ରିକାଯ ଆମାର ଭ୍ରମ ଫିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖେ କୋନୋ ଦେଶେରାଇ ଭିସା ପେତେ ତେମନ ବାମେଲା ପୋହାତେ ହୁଏନି । ଇତ୍ୱୋପିଯାନରା ସବ କିଛୁତେଇ ପ୍ରମାଣ ଚାଯ । ପ୍ରମାଣ ଦେଖାତେ ପାରଲେଇ କାଜ ହୁଏ । ଏକଦିନ ବଶିର ଟେଲିଫୋନ କରଲ ଆମାକେ । ଆମି ତେ ଆବାକ । ସେ ଆମାର ନନ୍ଦର ଜୋଗାଡ଼ କରଲ କୀଭାବେ? ସେ ଜାନାଲ, ଆମାର ଆସାର ଖବର ଇତୋମଧ୍ୟେ ବହୁଜନ ଜେନେହେନ । ଏଟା ତେମନ ଆବାକ ହୁଓଯାର ମତୋ ଘଟନା ନାୟ । ଯାଇହୋକ, ବଶିରର ସାଥେ କଥା ବଲେ ଭାଲୋ ଲାଗିଲ । ଅନେକ ଆଗେ ସାଇକେଳେ କରେ ଇତାଲି ଏସେ

ଜେସମିନ ପପସମ୍ଭାଟ ଆଜମ ଖାନେର ଆତ୍ମୀୟ । ତାରା ୪ ଜନ (ତିନି ଜନ ଛେଲେ ଓ ସେ) ମିଲେ ସୁଇଜାରଲ୍ୟାନ୍ଡେ ହେଁ ଇତାଲି ଏସେଛ ଏବଂ ଏଖାନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବିଯେ କରେ ସଂସାରୀ ହେଁଯେ । ସେ ଏକଟି ବାଙ୍ଗଲିର ଦୋକାନେ କାଜ କରେ ଶୁନେ ଦେଖା କରତେ ଗେଲାମ । କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକକେ ପାଓୟା ଗେଲ ନା ଦୋକାନେ । ପିଯାଛ୍ଛ ଭିଟ୍ଟୋରିଯାତେ ପ୍ରଚୁର ବାଂଲାଦେଶର ଦୋକାନପାଟ, ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟ ରହେଇ । ଇତ୍ୟାନ୍ତେର ପର ଇତ୍ୱୋପେର ଇତାଲିତେଇ ସବଚେଯେ ବେଶ ବାଙ୍ଗଲି ବସବାସ କରେନ । ନାସିମ ନାମେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂବାଦିକେର ସାଥେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଖାଇଲାମ । ପିଯାଛ୍ଛ ଭିଟ୍ଟୋରିଯାତେ ପ୍ରଚୁର ବାଂଲାଦେଶର ଦୋକାନପାଟ, ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟ ରହେଇ । ଇତ୍ୟାନ୍ତେର ପର ଇତ୍ୱୋପେର ଇତାଲିତେଇ ସବଚେଯେ ବେଶ ବାଙ୍ଗଲି ବସବାସ କରେନ । ନାସିମ ନାମେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂବାଦିକେର ସାଥେ ଦେଖା । ତାର ମାଧ୍ୟମେ ରନି ଭାଇ ଓ ଆରା ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଜନ, ସଂଗ୍ଠନରେ ସାଥେ ପରିଚିତ ହେଁ ।

ଏବାର ଏକଟ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ସାଇକେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ଥେକେ ୧୪୪ ଜନ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣେ ବୈରିଯେଇଲେ, ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ୧୪୪ ଜନ ନାରୀ । ୩୭ ଜନ ସଫଳ ହେଁଲେ । ୬ ଜନ ବିଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଏହିଗ କରେନେ ଭ୍ରମଗପଥେ । ଗିନେସ ବୁକ ଅବ ରେକର୍ଡ୍ସେର ୧୯୯୭ ସାନେର ସଂକଷରଣ

ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇକେଳେ ଚଢେ ସର୍ବଥିମ୍ବ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ କରେନ ଇମରାଇଲେର ଟଲ ବାଟ, ୭୭ ଦିନ ୧୪ ଘନ୍ଟାଯାର ୧୯୯୨ ସାଲେର ୧୭ ଆଗସ୍ଟ ତାର ଭ୍ରମଣ ସମ୍ପଦ ହୁଏ ।

ଆମେରିକାର ଓହାଇଓ ରାଜ୍ୟର ସିଟିଭେନ ନିଉମ୍ୟାନ ୧୯୮୩ ସାଲେର ୧ ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖ ଥେକେ ହାଟିତେ ଶୁରୁ କରେଛିଲେ ଏବଂ ୪ ବର୍ଷରେ ୩୬ ହାଜାର ୨୦୦ କିଲୋମିଟାର ହେଁଟେ ସବଦେଶ ଫେରେନ । ତବେ ଗିନେସ ବୁକ

ଅବ ରେକର୍ଡ୍ସେର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଦବୁଜେ ସର୍ବଥିମ୍ବ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ କରେନ ଆମେରିକାର ଡେଭିଡ କାସ୍ଟ । ତିନି ୪ ବର୍ଷରେ ୨୩ ହାଜାର ୨୫୦ କିଲୋମିଟାର ହେଁଟେ ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ଘଟାଯାଇଲା ୧୯୭୪ ସାଲେର ୫ ଅକ୍ଟୋବର ।

ରୋମ ନଗରୀର ଆଦି ଇତିହାସ ନାନା ରୂପକଥା ଦିଯେ ଭରା । ସେଇ ସବ କାଳ୍ପନିକ କାହିନିର ଭେତର ଥେକେ

ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଖୁବେ ପାଓୟା କଟ୍ଟିବାର । ରୋମ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଜାତାନ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଜାନି ଓ ବୀରଦେବ ନିଯେ

ଗଠିତ ସେନଟ ରାଜ୍ୟଶାସନ କରେନ । ସେଇ ସମୟ ମେସିଡୋନିଆ, ଗ୍ରିସ, ସ୍ପେନ, ମିଶର ପ୍ରଭୃତି ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଭ୍ୟାଟିକାନେ ଯାଓ୍ୟାର ପଥେ

ଦେଖିଲାମ ଭିକ୍ଟର ଇମାର୍ଯୁଯେଲେର ପ୍ରାସାଦ । ଅପୁର୍ବ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରାଲ୍ୟ । ଅର୍ଧ ବୃତ୍ତାକାରେ ଅବହିତ । ସବ କିଛି

ପ୍ରେତପଥରେ ନିର୍ମିତ । ମନ୍ଦିରଟି ହ୍ୟାତାଲା ବାଡିର ସମାନ ଡୁଚ୍ । ଏକେବାରେ ଓପରେ ଦୁଦିକେ ଦୁଖାନ ରଥ । ଚାରଟି କରେ ଘୋଡ଼ାଯ ଟେନେ ନିଯେ ଯାଇଁ । ରଥେ ଏକଜନ କରେ ଦେଖାର୍ଯ୍ୟମାନ ମାନୁଷ । ତାର ନିଚେ ଅର୍ଧ ବୃତ୍ତାକାରେ ଏକ ସାର ଗୋଲ ଗଷ୍ଟିଜ । ଅଶ୍ଵାରେ ହାତି 'ରୋମନ ନାଇଟ' -ରେ ସୁବିଶାଳ ବ୍ରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୌଥ ଏଡାଯ ନା । ରୋମେର ଆଧୀନିତାର ସ୍ଥାତ୍ମିକୋଷ ଏହି ମନ୍ଦିର । ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ଥପତି କାଟ୍ଟି

ଗିଉଡ଼େପିଲ୍ ସ୍ୟାକ୍ଚୋନି ୧୮୮୫ ସାଲେ କାଜ ଶୁରୁ କରେ ୧୯୧୧ ସାଲେ ଶେଷ କରେନ । ଏଟି 'ନିଓ-କ୍ଲାସିକ'

ଶିଳ୍ପଶୈଳୀତେ ନିର୍ମିତ । ଭେନିସେର ବିଖ୍ୟାତ ଭାକ୍ଷର ସିଯାରଦ୍ୟା ୨୦ ବର୍ଷ ଧରେ ଓହି ଅଶ୍ଵାରେହି ମୂର୍ତ୍ତି

ନିର୍ମାଣ କରେନ । ଏ ବକମ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଯ ଛବି ନା ତୁଳେ ପାରି । ମନୁମେଟେର ସାମନେ ସାଇକେଳସହ ବେଶ କିଛୁ ଛବି ତୁଲାମ । ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ମେଯେ ସହସ୍ରୋଗିତା କରଲ ଛବି ତୁଲାତେ । ଜୀବନ୍ତ ମନୁମେଟେକେ ବାଦ ଦିଇନି ଆମାର ସାଥେ ଛବିତେ । ଇତାଲିଯାରା ଏତ ସୁନ୍ଦର କେନ? ଆମାର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଇତ୍ୱୋପେର ସବଚେଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ହିଁଛେ

ଇତାଲିଯାନରା ଏବଂ ତାରପରଇ ଗୋଟିଏ ମେଯେରେ ଯାଇଁବାରିରେ ହେଁବାରିଯାତେ ହେଁବାରିଯାଥାନେକେର ମତୋ ସମଯ

ବେତିରେ ଉତ୍ତର ଥେକେ ଦକ୍ଷିଣେ ପ୍ରାବାହିତ । ନଦୀର ବାଁ ତୀରେ ସାତଟି ପାହାଡ଼ ନିଯେ ଏହି ନଗରୀ ପ୍ରଥମ ଗଡ଼େ ଉଠେଲିଲ । ସେଇ ପାହାଡ଼ଗଲୋ ହିଁଛେ । କ୍ୟାପିତୋଲିନେ, କୁଟୁରିନାଲ, ଭିମିନାଲ, ଏସକୁଇଲିନେ, ସିଲିଯାନ, ଏଭେନତାଇନେ ଓ ପାଲାତିନେ । ଜାନା ଯାଇ, ମହାନଗରୀର ପ୍ରଥମ ଜନବସତି

ଗଡ଼େ ଉଠେଲିଲ ପାଲାତିନ ପାହାଡ଼ । ପିଯାଂସା ଭିଟ୍ଟୋରିଯା ଥେକେ ସାଇକେଳେ ଚେପେ ଭ୍ୟାଟିକାନ ସିଟିଟିତେ ଯାଇ । ପ୍ରାୟ ସହିତାଖାନେକେର ମତୋ ସମଯ ଲାଗିଲ । ଭ୍ୟାଟିକାନ ସିଟି ତାଇବାର ନଦୀର ଡାନ ତୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ପାହାଡ଼ର ବିପରୀତ ଦିକେ । ଭ୍ୟାଟିକାନେ ଦିକେ ଦୂଟି ପାହାଡ଼ ଆଛେ । ନାମ ମ୍ୟାରିଓ ଏବଂ

ଗିଯାନିକୋଲୋ । ନଦୀର ତୀରେ ସାଇକେଳେ ଚାଲାଇଁଛି, ଏକଟୁ ଓ କ୍ଲାନ୍ଟି ଲାଗିଛେ ନା । ନତୁନ ଦେଶ, ନତୁନ ଜାସଗା ଦେଖାଇ ଆନନ୍ଦିତ ଆଲାଦା ।

ଲିଟୁ ଭାଇଯେର କାହେ ଥାକତେ ପେରେ ମାଥା ଗୌଜାର ଠାଇ ଓ ପେଟରେ ଚିନ୍ତା କରତେ ହଛେ ନା । ମନେର ଆନନ୍ଦେ ତାଇ ସୁରତେ ପାରଛି । ଫୋଯାରା ଥାକତେ ଥାବାର ପାନିର କୋଣେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ନା । ରୋମ ଓ କାନାଡ଼ାର ମତୋ ସୁମିଷ୍ଟ ପାନି ପୃଥିବୀର କୋଥାଓ ପାଇନି । ପ୍ରାଣ ଜୁଡ଼ିଯେ ଯାଯା । ଠିକ ଯେମନ ବାଂଲାଦେଶର ଚାପକଳେର ପାନି । କଲୋସିଆମେର ଛବି ଅନେକ ଆଗେଇ ଦେଖେଛି । ଏଟି ରୋମେର ଇତିହାସେ ଏକ ଉତ୍ତେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟ୍ୟ । କଲୋସିଆମ ଛିଲ ରୋମନଦେର ଜୀବନେର ପ୍ରାତିକ । ଧର୍ମଧ୍ୟାଜକ ବେଦେ ବେଳେଛିଲେନ- While stands the colosseum, Rome shall stand, when falls the colosseum, Rome shall fall; and when Rome falls, with it shall fall the world. ତାର ଏହି ଉତ୍କର୍ଷ ରୁହିରେ ୨୦୦ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟେଇ କଲୋସିଆମେର ପତନ ଘଟେ । ୧୦୮୪ ଖିଦ୍ରାଦେ ଜାର୍ମାନରା ରୋମନଗରୀ ଲୁଟ୍ଟନେର ସମୟ କଲୋସିଆମ ଭେଦେ ଫେଲେ । ଆର ତଥିନ ଥେକେଇ ରୋମ ସାମାଜ୍ୟେର ପ୍ରକ୍ରିୟାକାରୀ ପତନ ଶୁରୁ ହୁଏ । କଲୋସିଆମ ଛିଲ ବଧ୍ୟଭୂମି । ସେକାଳେର ରୋମନଦେର ଜୀବନୀ ପ୍ରଦଶନୀ Ludi circenses' ଏର ଜନ୍ୟାଇ କଲୋସିଆମ ସୁପରିଚିତ ହେଯ ଉଠେଛିଲ । ରୋମାନରା ଯେନ ନିଷ୍ଠର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ହେଯ ଓଠେନ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖିଟ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥେକେଇ ଓଇ ନିଷ୍ଠର ପ୍ରଦଶନୀର ପ୍ରଚଳନ ହେଯେଛି । ଦର୍ଶକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୋସିଆମେର ରଙ୍ଗଭୂମିତେ ମାନୁସେ-ମାନୁସେ କିଂବା ମାନୁସେ ପଞ୍ଚତେ ଯୁଦ୍ଧ ହତ, ମୃତ୍ୟୁ ନା ହେଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଡାଇ ବନ୍ଧ ହତ ନା । ଅନେକ ସମୟ ଦୁପକ୍ଷେରଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାକାରୀ । ଏହି ପ୍ରଦଶନୀର ଜନ୍ୟ ସେକାଳେ ରୋମେ ଶତ ଶତ 'Gladiator' ବା ପେଶାଦାର ଯୋଦ୍ଧା ଛିଲ । ତାରା ପ୍ରତିଦିନ ମରଣପଣ କରେ ଲଡାଇ କରନେ । ଏକବାର ଏକ ଜ୍ୟାନ୍ତୀ ଉତ୍ସବେ ଏହି କଲୋସିଆମେ ୧୦୦ ଦିନେ ୧୦୦୦ ପଞ୍ଚ ହତ୍ୟା କରା ହେଯେଛି । ପାଠ୍ୟକେର ଜନ୍ୟ ବଲଛି-ଆପନାରା ରାସେନ କ୍ଷାଣ ଅଭିଭାବିତ 'ପ୍ଲାଇଟୋର' ନାମେ ଅକ୍ଷାର ପାଓଯା ଛବିଟି ଦେଖିଲେ କଲୋସିଆମ ସମ୍ପର୍କେ, ତାଦେର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କେ କିଛି ଧାରଣା ପାବେନ । ଖିସ୍ଟୀଯ ପଞ୍ଚମ ଶତକେ ତେଲିମାଶୁ (Telemachus) ନାମେ ଜୈନେକ ପ୍ରାଚୀଦେଶୀୟ ସାଧୁ ଏକଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦଶନୀର ସମୟ ହଠାତ୍ କରେଇ ବଧ୍ୟଭୂମିତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାର ମାବାଖାନେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଯୁଦ୍ଧ ଥେମେ ଗେଲ । ତଥିନ ତିନି ଦର୍ଶକରେ ଦିକ୍ଷିକେ ଫିରେ କରଜୋଡ଼େ ଏହି ନିଷ୍ଠର, ଅନାନ୍ଦିକ ଖେଳ ବନ୍ଦେର ଆହ୍ଵାନ ଜାନାନ । କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକରା ସେଇ

କଲୋସିଆମ ଛିଲ ବଧ୍ୟଭୂମି । ସେକାଳେର ରୋମନଦେର ଜୀବନୀ ପ୍ରଦଶନୀ Ludi circenses' ଏର ଜନ୍ୟାଇ କଲୋସିଆମ ସୁପରିଚିତ ହେଯ ଉଠେଛିଲ । ରୋମାନରା ଯେନ ନିଷ୍ଠର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ହେଯ ଓଠେନ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖିଟ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥେକେଇ ଓଇ ନିଷ୍ଠର ପ୍ରଦଶନୀର ପ୍ରଚଳନ ହେଯେଛି । ଦର୍ଶକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୋସିଆମର ରଙ୍ଗଭୂମିତେ ମାନୁସେ-ମାନୁସେ କିଂବା ମାନୁସେ ପଞ୍ଚତେ ଯୁଦ୍ଧ ହତ, ମୃତ୍ୟୁ ନା ହେଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଡାଇ ବନ୍ଧ ହତ ନା । ଅନେକ ସମୟ ଦୁପକ୍ଷେରଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାକାରୀ । ଏହି ପ୍ରଦଶନୀର ଜନ୍ୟ ସେକାଳେ ରୋମେ ଶତ ଶତ 'Gladiator' ବା ପେଶାଦାର ଯୋଦ୍ଧା ଛିଲ । ତାରା ପ୍ରତିଦିନ ମରଣପଣ କରେ ଲଡାଇ କରନେ । ଏକବାର ଏକ ଜ୍ୟାନ୍ତୀ ଉତ୍ସବେ ଏହି କଲୋସିଆମେ ୧୦୦ ଦିନେ ୧୦୦୦ ପଞ୍ଚ ହତ୍ୟା କରା ହେଯେଛି ।

ପ୍ରେମମୟ, ମହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆବେଦନେ ସାଡା ନା ଦିଯେ ଏକଯୋଗେ ତାର ଓପର ପାଥର ଛୁଢ଼ିତେ ଶୁରୁ କରଲ । ତିନି ମାରା ଗେଲେନ । କିନ୍ତୁ ତାର ଏହି ଆତ୍ମତାଗ ବିକଳେ ଯାଇନି । ତିନିଇ କଲୋସିଆମେର ଶେଷ ଶିକାର । ସେଦିନ ଥେକେଇ ସେଇ ନିଷ୍ଠର ପ୍ରଦଶନୀ ବନ୍ଧ ହେଯ ଯାଇ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଯ ମାଥା ନତ ହେଯ ଆମେ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ଜନ୍ୟ କତ ମାନୁସେର କତ ତାଗ, ବଲଦିନ, ପରିଶ୍ରମ ରହେଛେ ତାର ଶୌଭିଜ ଆମରା କ'ଜନ୍ମାଇ ରାଥି । ଏହି ଯେ ଆକାଶ କ୍ଷୁଦ୍ରିତ ପୃଥିବୀ ଅବାରିତ ସୀମାହିନ, ଏର ମାଝେ ଚଳେ ହେବ-ବାତିଲେର ସଂଗ୍ରହ ଚିରଦିନ; କତୋ ଯେ ରକ୍ତ ବରେହେ ସେଖାନେ କତୋ ଯେ ଜମେହେ ପାପ ସେଇ ଶୋକେ ଓଗେ ବନ୍ଧ, ହଦୟ କାଂଦଲୋ କି କୋନୋ ଦିନ? ୧୯୦୦ ବର୍ଷ ଆଗେ ଗଡ଼ କଲୋସିଆମେ ଅଧିକାଂଶଇ ଏଥିନ ଭାଙ୍ଗ । ଏକାଂଶ

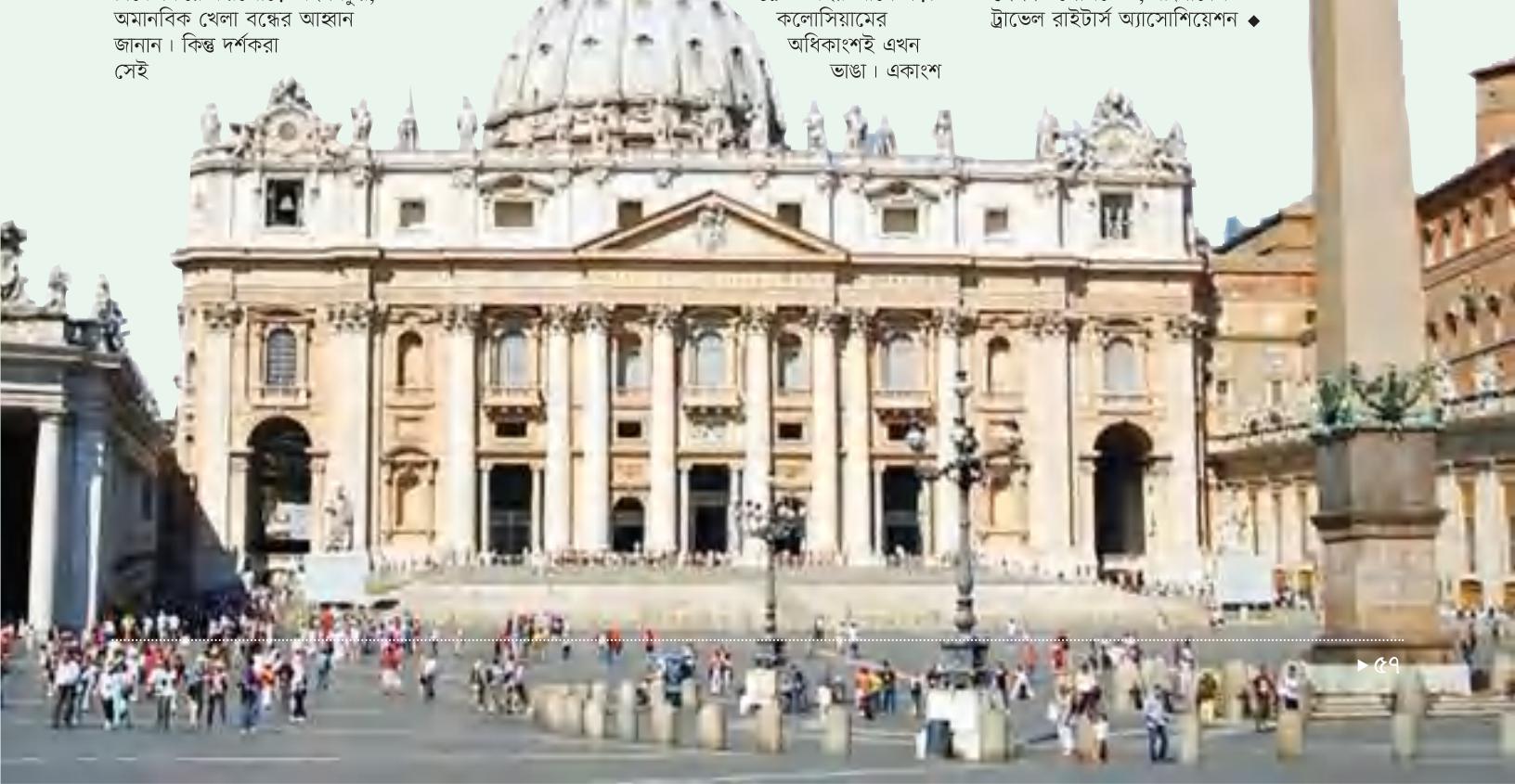
ଶୁଦ୍ଧ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆହେ । ବାଡ଼ିଟାଜୁଡେ ଧନୁକାକୃତି ଦରଜା ଆର ଦରଜା, ଖୁବଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିତେ । ବାଇରେର ଦିକଟା ଗୋଲାକାର ହଲେଓ ଭେତରଟା ଡିଙ୍କାକୃତି । ଏଟାଇ ଟେଡିଯାମେର ବିଜାନସମ୍ମତ ଗଡ଼ନ । ଦାକାର ବନ୍ଧୁ ରବି, ସୋହେଲ, ବାବୁ, ପରାଗ, ଆରିଫିଓ ତାଦେର ଏଲାକାର ବଡ଼ଭାଇ ସେଲିମ ଭାଇଯେର କଥା ଜାନତାମ, ଯିନି ଦୀଘଦିନ ଯାଏଁ ଇତାଲିତେ ଛିଲେନ । ସେଲିମ ଭାଇଯେର ବାସାୟ ଗେଲାମ ଲିଟୁ ଭାଇକେ ସାଥେ ନିଯେ । ସେଲିମ ଭାଇ ଏକ ବିଶାଲ ରାଜବାଢ଼ିତେ ଥାକେନ । ଏକ ଇତାଲିଯ ଭ୍ରମିକ ତାକେ ହେଲ କରେ ବାଡ଼ିଟି ଦିଯେଛେ । ସେଲିମ ଭାଇ ନିଜହାତେ ରାନ୍ନା କରେ ଆମାଦେର ଥାଓୟାଲେନ ଏବଂ ରାତେ ସବାଟି ଫୁଟବଲ ଖେଲ ଦେଖିତେ ବସଲାମ । ଫୁଟବଲ ବଲତେ ଇତାଲିଯରା ଏବଂ ସେଇ ସାଥେ ବାଙ୍ଗଲିରାଓ ପାଗଳ । ସେ କଦିନ ଇତାଲିତେ ଛିଲାମ, ଦେଖେଛି ସବାଟି ଫୁଟବଲ ପାଗଳ । ଫୁଟବଲ ବଲତେ ଅଭିନାଶ ହେଲ । ତାରା ତାଦେର ସବ କାଜକର୍ମ ଛେଦେ ବସେ ଥାଲେ ଦେଖିଛି, ତାଦେର ମତୋ ଆମିଓ ପାଓନୋ ରସି, ବ୍ୟାଜି-୭-ର ଭକ୍ତ । ଇତାଲିଯ ଭାସା ଓ ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତିର । ଅନ୍ତତ ଆମାର ତାଇ ମନେ ହେଯେଛେ । ଆର ଇତାଲିଯ ଶଦ୍ଦ 'ଚାଓ' (ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଦା ହାଫେଜ) ବିଶ୍ଵଭାସ୍ୟ ପରିଗଣ ହେଯେଛେ । ପାସ୍ଟୋ, ପିର୍ବୋ ଓ ସ୍କ୍ୟାଗାଟିର ତୋ ତୁଳନାଇ ନାହିଁ । ଆୟୁରେର ଦେଶ ବଲେ ଥାଖେନ ମଦ ଖୁବ ସନ୍ତା । ପକେଟମାର ଓ ଯାୟାବରଦେର ବେଶ ଉତ୍ସପାତ ।

ସବ ସମ୍ବାଦେ ସାବଧାନ ଥାକତାମ, ଯେନ କୋନେ ଠାଗେର ପାଲ୍ଲାଯ ନା ପଡ଼ି ।

ଇତାଲିଯରା ରସିକତା କରେ ବଲେନ, ତାଦେର ରାଜଧାନୀ ରୋମ, ଶିଳ୍ପ ରାଜଧାନୀ ତୁରିନ ଓ ଅର୍ଥନ୍ତିକ ରାଜଧାନୀ ମିଲାନ ।

ଆବାର ଯାର ଅତିରିକ୍ତ ତାରା ବଲେନ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ରାଜଧାନୀ ଭେନିସ, ସମୁଦ୍ରାବାର ରାଜଧାନୀ ଜେନୋଯା ଆର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସେ ତୋ ଇତାଲିର ଅବିସଂବାଦିତ ସାଂକ୍ଷିକ ରାଜଧାନୀ । ଇତାଲିର ସବ ଶହରଇ ଶିଲ୍ପ-ଇତିହାସ ସମ୍ମଦ୍ଧ ।

ଲେଖକ: ପ୍ରେସିଡେଟ୍, ବାଂଲାଦେଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେ ରାଇଟାର୍ସ ଅୟାସୋଶିଯେଶନ ◆





গরমের দেশে শীতের কামড়!

■ জাকারিয়া মঙ্গল

বেরসিক সূর্যটা বেজায় তেজ ছড়াচ্ছে। আদৃতা মেখে ভ্যাপসা হয়ে আছে বাতাস। গরমে হাঁসফাঁস দশা। একটানা একটু হাঁটলেই দরদরিয়ে ঘাম ছুটছে। গত পরঙ্গ অষ্টম প্রাকৃতিক আশৰ্য খ্যাত সিগারিয়া রকে উঠতে গ্যালন গ্যালন ঘাম ঝরেছে। গতকাল প্যারাডেনিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিশাল বৃক্ষ সারির ছায়াতেও হৃল ফুটিয়েছে গরম। যদিও আজ সকালে ক্যান্ডির আকাশে বিরবিরির বৃষ্টি একটা সহনীয় দিনের আভাস দিয়েছিল। কিন্তু দিনের দ্বিতীয় প্রহরেই সেই স্পন্দি উধাও। শ্রীলংকার আকাশে ফের সৃষ্টেজের বেয়াড়া দাপট। তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। এমন উচ্চমাত্রার তাপমাত্রা কমতে কমতে শিগগিরই যে ১০ ডিগ্রির কাঁপুনি ধরাবে তা বুবাতে কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগেনি।

এখন মার্চ মাস। এ সময়টায় ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ওঠানামা করে শ্রীলংকার তাপমাত্রা। যদিও এইটকেন স্পেসের ট্রাইরিস্ট বাসটার ভেতরে আরামদায়ক শীতলতা। হাতের বাঁয়ে মহাবেলি। শ্রীলংকা দীর্ঘতম নদী। ক্যান্ডি ছাড়ার পর থেকেই সমান্তরালে রাস্তার সঙ্গী। তবে ট্রাইরিস্ট বাসটা ছুটছে দক্ষিণে। আর মহাবেলি বইছে দক্ষিণ থেকে উন্নতে।

গামপেলা শহরে সেতু পার হয়ে মহাবেলির সঙ্গ ছাড়লো ট্রাইরিস্ট বাস। ক্রমশ আরও উঁচু হতে থাকলো রাস্তা। দুপাশের পাহাড়গুলো সবুজে ছাওয়া। গাছপালার ফাঁকে কোথাওবা অনেক নিচে শুয়ে থাকা

এখানকার গোল্ডেন টি পৃথিবীর অন্যতম সেরা চা হিসেবে স্বীকৃত। অতি স্বচ্ছ, সুস্বাদু, সুবাসিত। মৌসুমি এই চায়ের চাষ হয় অল্প সময়ে। উৎপাদনও সীমিত। তাই দামও বেজায় চড়। এর প্রক্রিয়াজাতকরণ ফর্মুলা খুবই গোপন। নিজেদের কারখানারও সবাইকে জানতে দেয় না প্লেনলাচ। একবার চুমুক দিলে এই চায়ের স্বাদ ভুলে যাওয়া মুশকিলই বটে। এই দেশের চা উৎপাদক হিসেবে পরিচিত সাতটি প্রদেশের প্রতিটিতেই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বাদ, সুগন্ধের চা। মোটামুটি এক খুতুর দেশ হলেও এই চীপে বছরের অন্তত অর্ধেক সময় মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় উন্নত থেকে। বছরের বাকি অর্ধেক দক্ষিণ থেকে। পরম্পর বিপরীত গন্তব্যের দুই মৌসুমি বায়ু শ্রীলংকার চায়ের বৈচিত্র্যে অন্যতম অবদান রাখে। এমনকি এ দেশের একটি প্রদেশের ভেতরেই অঞ্চলভেদে চায়ের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়

উপত্যকা। প্রতিটি উপত্যকায় ধানের চাষ। কোথাও সবুজ। কোথাওবা হলুদ বর্ণ নিয়ে পেকে যাওয়ার আভাস ছড়াচ্ছে।

গাড়িটা হাঁচাঁ বাঁক নিয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে অনেকটা খাড়া উঠতে থাকে। পাহাড়ি রাস্তার ওপর আরেকটা পাহাড়। তার ওপর এক চিলাতে সমতল চতুর। একপাশে তিনতলা সমান উঁচু লহাটে এক টিমের কাঠামো। প্লেনলাচ চা কোম্পানির কারখানা।

খাড়া মই বেয়ে উঠে ওপর থেকেই শুরু হয় পরিদর্শন। কাঁচাপাতার আদৃতা কমানো, কাঁচা পাতা থেকে শুকনো গুঁড়োয় পরিণতি, আরও মিহি করে প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী করে মোড়কজাত- সব মিলিয়ে অনেকগুলো ধাপ। দেখতে দেখতে ওপর থেকে নিচে নামা। বের হওয়ার মুখে ছেট্ট একটা জাদুঘরের মতো। সেখানে প্লেনলাচের অর্গানিক

বাগানগুলোর ম্যাপের পাশাপাশি চা বাগান ও ফ্যান্টেরির যন্ত্রপাতি, শ্রীলংকান চায়ের ইতিহাস, এমনকি চায়ের গুণগুণের সচিত্র প্রতিবেদন। কারখানার অদূরে সেলস সেটার। কতো যে মোড়ক। কতো যে ফেন্ডার। দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়। পাশের বারান্দায় নমুনা চা পানের আয়োজন। ঠিক নিচেই মূল রাস্তাকে এখান থেকে একটু সরুই লাগে। রাস্তার ওপাশে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়টা। ওখানে গাছপালা আচ্ছাদিত উপত্যকা।

তার ওপাশের খাড়া পর্বতটা যেনে আকাশ ছুঁতে ছাইছে। পৃথিবীখ্যাত সিলন চায়ের ফ্যান্টেরি পরিদর্শনে আরও দর্শনার্থী এসেছে।

অনেকেই উপভোগ করছেন তাজা চা। সেরা চা যারা খোজেন তাদের জন্য এই ফ্যান্টিরি নিঃসন্দেহে অতি উত্তম ঠিকানা। এখানকার গোল্ডেন টি পথিকীর অন্যতম সেরা চা হিসেবে স্থীরূপ। অতি স্বচ্ছ, সুস্বাদু, সুবাসিত। মৌসুমি এই চায়ের চাষ হয় অল্প সময়ে। উৎপাদনও সীমিত। তাই দামও বেজায় চড়া। এর প্রক্রিয়াজাতকরণ ফর্মুলা খুবই গোপন। নিজেদের কারখানারও সবাইকে জানতে দেয় না ফ্লেনলচ। একবার চুমুক দিলে এই চায়ের স্বাদ ভুলে যাওয়া মুশকিলই বটে। এই দেশের চা উৎপাদক হিসেবে পরিচিত সাতটি প্রদেশের প্রতিটিতেই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বাদ,



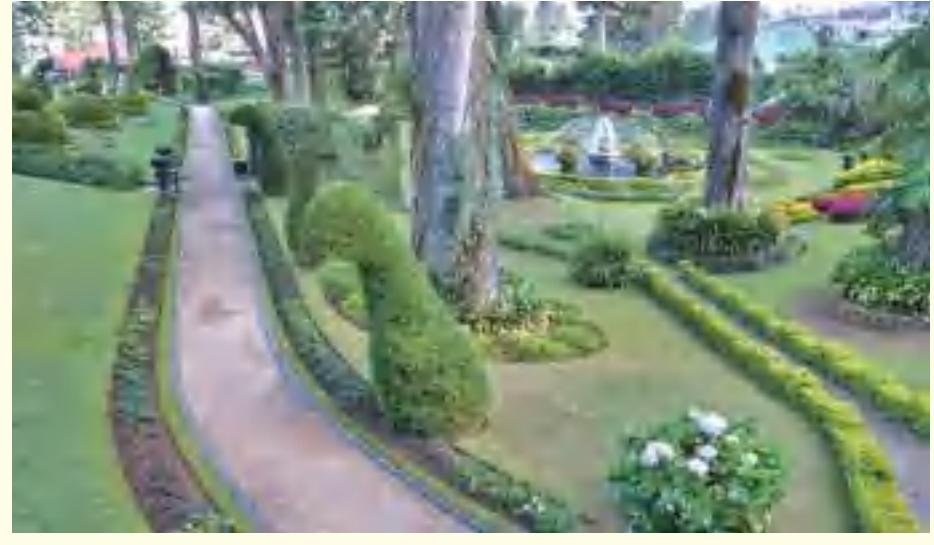
সুগন্ধের চা। মোটামুটি এক ঝাতুর দেশ হলেও এই দীপে বছরের অস্ত অর্ধেক সময় মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় উভর থেকে। বছরের বাকি অর্ধেক দক্ষিণ থেকে। পরস্পর বিপরীত গন্তব্যের দুই মৌসুমি বায়ু শ্রীলংকার চায়ের বৈচিত্র্যে অন্যতম অবদান রাখে। এমনকি এ দেশের একটি প্রদেশের ভেতরেই অঞ্চলভেদে চায়ের স্বাদ ভিন্ন হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সাগরপথ থেকে দুই হাজার ফুট উচ্চতায় যেমন চা হয়, তেমনি শীতল শহর নুয়ারা এলিয়ার পাহাড়ের ঢালে চা জন্মে ও হাজার ফুটেরও অধিক ওপরে।

ফ্লেনলচ চা ফ্যান্টিরির পর রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর গিরিখাদ, উপত্যকার খাড়া ঢাল। ওই খাড়া ঢালেই বুলে আছে ওক রে টি বুশ

নামের রেস্তোরাঁ। কাঁচঘেরা রেস্তোরাঁয় বসে মধ্যাহ্নভোজের সময়টাতেও সঙ্গী হয়ে রইলো অপরূপ পাহাড়ি সৌন্দর্য। মাথার ওপর তখনও সমানে তেজ ছড়িয়ে যাচ্ছে সূর্য। উপত্যকার অপর পাশের খাড়া পাহাড়ের ঢালে ফসল ক্ষেত। বাংলাদেশের মতো জুম চাষ এন্ডিকটায় চোখে পড়লো না। এসে পাহাড়ে চাষ হচ্ছে হিমালয়ের মতো ধাপ পদ্ধতিতে। পর্বতশ্রেণি বেষ্টিত সবুজ উপত্যকায় গাঢ়পালার ফাঁকে কোটমালে রিজার্ভ। রামবোদা প্রপত্তের পানি লম্বা খাল হয়ে এসে জমা হচ্ছে ওখানটায়। মধ্যপ্রদেশের পুসেলাবার এই অঞ্চলটার নাম

রামবোদা এলাকাটাই সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় এক কিলোমিটারের কাছাকাছি উঁচু। সামনের পথ ক্রমে আরও উঁচু হচ্ছে। পাহাড়ের শরীর জড়িয়ে রাস্তা। আকার্বাকা। একটি প্রপর ট্যারিস্ট লজ। হিমছাম শহর। ইন্টারনেটে শ্রীলংকা সার্চ দিলে সবুজ পাহাড় পেঁচিয়ে ওটা অপরপ যে রাস্তাটা দেখা যায়, এটা সেই রাস্তা। একটা পিচালা ফিতা যেনে পাহাড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে।

রাস্তার পাশে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের ঢাল। সবুজ উপত্যকার ওপাশের পাহাড়গুলো চা গাছে ছাওয়া। পাহাড়ি চা বাগানে রোদ-হ্যায়ার অপরপ খেলা।



রামবোদা। এটি মূলত একটি গ্রাম। এখানকার সবকিছুর নামে এই রামবোদা জুড়ে দেওয়ার চল। রামবোদা প্রাপ্ত, রামবোদা হোটেল, রামবোদা টানেল। ২২৫ মিটার দীর্ঘ রামবোদা রোড টানেল শ্রীলংকার রাস্তায় নির্মিত দীর্ঘতম সূড়ঙ্গ। পাহাড়ের পেট কেটে হাইওয়েটাকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে ওপাশে। তারপর বাঁক ঘূরতেই বাঁয়ে রামবোদা প্রাপ্ত এলাকা। এন্ডিকটায় বিশ্বায়কর উচ্চভূমি, সমতল, শৈলশিরা, স্ন্যোত ও পর্বত শ্রেণির অভূতপূর্ব সম্পত্তি। ১০৯ মিটার উঁচু থেকে আছড়ে পড়া রামবোদা প্রাপ্তের অপরপ আকৃতিক দৃশ্য মনের ভেতর ঘোর ধরিয়ে দেয়। লাগোয়া বনে দৰ্গন্ড পাথির কুজন প্রকৃতির সুরে বেধে নেয় পর্যটককে।

পড়স্ত বিকালে ট্যারিস্ট বাস প্রবেশ করে নুয়ারা এলিয়ায়। মধ্যপ্রদেশের এই জেলা শ্রীলংকার অন্যতম ট্যারিস্ট জেল। এর সদর দপ্তর দেশের শীতলতম পার্বত্য শহর হিসেবে পরিচিত। শ্রীলংকার সবচেয়ে বড় পর্বতশ্রেণি পিদুরতালাগালার কোলে গড়ে ওটা নুয়ারা এলিয়া ভূপর্ণ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উঁচুতে। জেলার প্রশাসনিক রাজধানীর নামও নুয়ারা এলিয়া।

পাহাড়ের উপরে এক চিলতে সমতলে গড়ে উঠেছে বলে এই শহরটাকে বলা হয় টেবিল ল্যান্ড। এ জনপদের আর এক নাম আলোর শহর। যদিও এখানকার প্রস্তরলিপি হাজার বছর আগের সভ্যতার পরিচয়বাহী। কিন্ত, উনিশ শতকে নুয়ারা এলিয়ার নতুন যাত্রা শুরু হয় ইংরেজদের হাত ধরে।

১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নীল নদীর অনুসন্ধানকারী স্যামুয়েল বেকার এ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। শীতল জলবায়ুর কারণে এই শহর শ্রীলংকায় ব্রিটিশ বেসামরিক কর্মচারীদের পছন্দের স্থানে পরিণত হয়। এ স্থানের নাম হয়ে যায় লিটল ইংল্যান্ড। হয়ে ওঠে ইংরেজদের হাতি, হরিণ, শেয়াল শিকারের গ্রাউন্ড। গড়ে ওঠে গলফ, পোলো, রেসকোর্স, ক্রিকেট মাঠ। যদিও শহর হিসেবে নুয়ারা এলিয়ার নবব্যাপ্তা শুরু হয় আরও আগে। ড. জন ডেভি নামে এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা হাতি শিকার করতেন এখানে। অনেকটা

বার্নস হল পরিচিত হয়ে ওঠে গ্র্যান্ড হোটেল নামে। শেষ বিকালের নরম আলোয় ট্যুরিস্ট বাস থামে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে। গাড়ি থেকে নামতেই শুরু হলো শিরশিরে বাতাসের শীতল কামড়। সামনে বড় বড় গাছপালায় ছাওয়া অভিজ্ঞাত ব্রিটিশ কাঠামো। পুরো আয়োজনে বাসা-বাড়ির ছাপ। দোতলায় ওঠার জন্য পালিশ করা কাঠের সিঁড়ি। পাশের একটা কক্ষে এই হোটেলে অতিথি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের ছবি টানানো। তাদের ভেতরে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, মার্শাল টিটো, থমাস লিপ্পটন, রানি প্রথম



শখের বশেই হাতি শিকার প্রতিযোগিতা আয়োজন শুরু করেন তিনি। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীলংকার পঞ্চম গভর্নর হয়ে আসেন এডওয়ার্ড বার্ন। জন ডেভির হাতি শিকার প্রতিযোগিতার কথা শোনেন তিনি। চমৎকার আবহাওয়ার কথা শোনেন। নুয়ারা এলিয়া আসেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে এখানে নির্মাণ করেন অবকাশ কেন্দ্র। নাম রাখেন বার্নস হল।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনে ফিরে যাওয়ার সময় অবকাশ কেন্দ্রটির দায়িত্ব পান ডেভিড ইউলমার্ট হটেল। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রেজিনাল্ড বুচাম্প ডাউনাল নামে এক পরিকল্পনাবিদ বার্নস হল কিনে নিয়ে পরিণত করেন গেস্ট হাউসে। আরও ৫০ বছর পর ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে সেটি কিনে নেয় নুয়ারা এলিয়া হোটেল কোম্পানি।

এলিজাবেথ।

ভেতরের বার হলটাকে এখনো আগের মতোই রাখা হয়েছে। পাশের ঘরে শতবর্ষী মুকাব টেবিল। প্রধান রেঙেরাঁর নাম এখনও বার্নস হলই আছে। পুরো হলের সাজসজ্জাতে ঐতিহ্য ও বনেদিয়ানার ছাপ। আধা শেড আধা উন্মুক্ত হোটেল লবিতে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ। এই হোটেল এখন শ্রীলংকার প্রত্তত্ত্ব বিভাগ যৌথিত জাতীয় ঐতিহ্য। পাহাড়ি শহরে ইতিহাস ও সংস্কৃতির মোড়কে বসবাসের নেশায় শৌখিন পর্যটকরা ছুটে আসেন এখানে।

গোটা শহর গ্র্যান্ড হোটেলের মতো ব্রিটিশ স্থাপত্যের ছড়াছড়ি। হিল ক্লাব, টাউন হল, সেন্ট অ্যাঞ্জুলি

হোটেল।

১৩ বর্গকিলোমিটারের এই পৌরশহরে জনসংখ্যা হাজার তিরিশেক। তার মানে জনবহুল শহর। কোনো নির্দিষ্ট খন্তু নেই। একটি বর্ধার মতো মেঘালী ঝাতু আছে কেবল। রাতে তাপমাত্রা নেমে যায়। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে রাতে থায়শহী দশের নিচে নেমে যায় তাপমাত্রা। এখানে সিংহদিনেরই আধিক্য। তবে শ্রীলংকান তামিল, ভারতীয় তামিল, শ্রীলংকান মূর ও মালয়সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। শ্রীলংকার আর সব শহরের মতো এখানেও সিংহলি ও তামিল ভাষা প্রচলিত। তবে দীর্ঘ সময় ব্রিটিশদের বসবাস বলে ইংরেজিটা খুব চলে।

সিংহলি ও তামিল নববর্ষের কারণে এপ্রিল এখানকার উৎসবের মাস। এ মাসজংড়ে হয় ব্যাস্ট শো প্রতিযোগিতা, মোটর রেসিং, ঘোড়দৌড়, গলফ টুর্নামেন্ট। গ্রেগরি লেকে বোটিং ও মাছধরা এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। ভিট্টেরিয়া পার্কে ভিড়

দিনভর প্রকৃতির সঙ্গ মেখে আসা

পর্যটকরা সঞ্চয়ার আলোয় শহর দেখতে বেরিয়েছেন। হোট, ছিমছাম শহরে জটিলা কম। হাই ইট্রিগোলও কম। গাড়িগুলো হৰ্ন ছাড়াই ছুটছে। একটা ক্রিক বয়ে গেছে শহরের মাঝখান চিরে।

কারগিলস গ্রাউন্ডের বিপরীতে স্থানীয় সবজি, ফলের মেলা। বই, খবরের কাগজের স্টল। সঞ্চয়ার বাতাসে শীতের কামড় বাঢ়ছে। স্থানীয় কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসছে এশার আজান। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট। শীত তাড়াতেই বুঁৰি ওয়াইন শপে শেষ মুহূর্তের ভিড় জমেছে। ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচে নুয়ারা এলিয়া। এই শহর খুব একটা রাত জাগে না।

করে পাথিপ্রেমীরা। গ্যালওয়ের ল্যান্ড বার্ড স্যাংচুয়ারি বন্য শুকর ও বার্কিং ডিয়ারসহ শ্রীলংকার অনেক পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণির আবাসস্থল। হটেল প্রেইন জাতীয় উদ্যানে আছে চিতাবাঘ, সাহার। সেখানে শ্রীলংকার দীর্ঘতম নদী মহাবেলির জন্ম। প্রকৃতি ও প্রাণিবেচিত্ব উপভোগ করার জন্য সেখানে আরও আছে বেকার জলপ্রপাত। আছে ওয়ার্ল্ডস অ্যান্ড। চূড়া থেকে যেখানে ঝপ করে চার হাজার ফুট নেমে গেছে খাড়া পাহাড়। তার একটু নিচেই আছে এক হাজার ফুট খাড়া মিনি ওয়ার্ল্ডস অ্যান্ড। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ৮১ কিলোমিটার দূরের ভারত মহাসাগর ও খান থেকে দিব্য নজরে আসে। চা বাগানের ভেতরে লাভাস লিপ বারনাও পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। কোনো এক প্রেমিক যুগল ওখানে আত্মাত দিয়েছিল বলেই বারনার এমন নাম বলে জনপ্রিয় প্রচলিত। ওই বারনাটা তাই যুগলদেরই বেশি টানে। এমন একটা সুন্দর শহরের সঞ্চয়াও সুন্দর। বিকালের চেয়ে শীতটা যদিও বেড়েছে। গতকালও যে দেশে কিছু সময় হাঁটলে জামাকাপড় খুলে ফেলতে মন চাইছিল, সেই একই দেশে এখন

সেই দেশেরই এই শীতল শহরের তাপমাত্রা কখনো ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়ায় না।

লেখক: মির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন ও প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক আমাদের বার্তা ◆

শ্রীলঙ্কার ভিসা তথ্য

অর্থ বা ব্যবসার জন্য উপমহাদেশের দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা যেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা বাধ্যতামূলক নয়। শ্রীলঙ্কা গিয়েই ৩০ দিনের অন এরাইভাল ভিসা নেয়া যায়। তবে ঢাকায় শ্রীলঙ্কা দুতাবাসে গিয়ে আগে থেকেই ভিসা সংগ্রহ করে নেয়াই ভালো। কারণ শ্রীলঙ্কা গিয়ে ভিসা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বনা যায় না।

ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথভাবে পূরণকৃত ভিসা আবেদন ফরম, অন্তত ছয় মাস মেয়াদ আছে এমন বৈধ পাসপোর্ট, পাসপোর্টের প্রথম পাঁচ পঞ্চাশ ফটোকপি, ফিরতি বিমান টিকিট এবং তার ফটোকপি, শ্রীলঙ্কা থেকে পাঠানো আমন্ত্রণপত্র বা অফার লেটার এবং সমাপ্তিক তেলা দুই কপি রঙিন ছবি।

এভোর্সমেন্ট: অর্থমন জন্য ডলারের এভোর্সমেন্টের বসিদ জমা দিতে হবে।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে পর্যাপ্ত ব্যাল্যান্স থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে দেয়া সনদ জমা দিতে হবে। তবে ভিসা আবেদনকারীর স্পন্সর থাকলে এভোর্সমেন্ট প্রয়োজন হবে না।

ভিসা আবেদনপত্র: শ্রীলঙ্কা দুতাবাসের ওয়েবসাইট থেকে ভিসা আবেদন ফরমটি ডাউনলোড করে নেয়া যায়। আবার শ্রীলঙ্কা দুতাবাসে গিয়েও (সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত) ভিসা আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। ডাউনলোড লিংক:

http://www.slhchedhaka.org/dl_visa.php
ভিসা ইস্যু: আবেদনপত্র জমা দেয়ার পরদিন বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪ টা মধ্যে ভিসা ইস্যু করা হয় (সরকারি ছুটি ছাড়া রোববার থেকে বহুস্মিতিবার)।

ঢাকায় শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনের ঠিকানা
হাউস- ১০, রোড- ৬২, গুলশান- ২ ঢাকা-
১২১২, টেলিফোন- ৮৮-০২-২২২২৯৬৩৫৫
ইমেইল- slhc.dhaka@mfa.gov.lk



সোয়েটার পরেও শীত লাগছে। প্রকৃতির কি অস্তুত বদলে যাওয়া! দিনভর প্রকৃতির সঙ্গ মেখে আসা পর্যটকরা সন্ধ্যার আলোয় শহর দেখতে বেরিয়েছেন। ছোট, ছিমছাম শহরের জটলা কম। হই হটেলগুলও কম। গাড়িগুলো হন ছাড়াই ছুটছে। একটা ক্রিক বয়ে গেছে শহরের মাঝখান চিরে। কারগিলস গ্রাউন্ডের বিপরীতে স্থানীয় সবাজি, ফলের মেলা। বই, খবরের কাপাজের স্টল। সন্ধ্যার বাতাসে শীতের কামড় বাড়ছে। স্থানীয় কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসছে এশার আজান। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট। শীত তাড়াতেই বুরি ওয়াইন শপে শেষ মুহূর্তের ভিড় জমেছে। শুমানের প্রস্তুতি নিচ্ছে নুয়ারা এলিয়া। এই শহর খুব একটা রাত জাগে না। চার্চ রোডের প্রান্তে একটু উচু জায়গায় জেটলিং সেন্ট এন্ড্রুস হোটেল। গ্র্যান্ড হোটেলের মতো অতো পুরোনো না হলেও এই হোটেলটাও প্রায় দেড়শ বছরের স্বৃতি বইছে।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোতে ব্রিটিশ আপত্যের সুনিপুণ শৈলী। ফুলবাগান ও গাছপালা আচ্ছাদিত লনের যেরে অপরপ্রাপ্ত। ছোট লবিতে কাঠের ফায়ারপেসে আগুন জলছে। সেই আগুনের ওম নিয়ে একটু সময় বসে থাকতে খারাপ লাগলো না। কাপেট মোড়ানো করিদোরের পাশে সারিবেঞ্চ কক্ষ। পেছনের দরজা খুললেই সুবুজ লন। এ হোটেলটার পরিশেশ আর বাসন্তাপনাতেও বাড়ি বাড়ি ভাব। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে পুরোনো সুরক্ষ টেবিলটা আছে এই হোটেলে। মোটা কাঁচের বোতলে পানি সাজিয়ে রাখা। নিজস্ব প্ল্যান্টের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে এরা।

রাতের খাবারের পর আজ্ঞা হলো অনেকক্ষণ। এরই মধ্যে সোয়েটারের ওপরে চাদর জড়াতে হয়েছে। দরোজার ওপাশে ফুলের বাগান। কাঁচের জানলা গলে হিম চুকতে থাকলো এবার। মাঝেরাত নাগাদ ১০ ডিগ্রিতে নেমে গেল তাপমাত্রা। তারপর দুটো কম্বলেও কাজ হলো না।

মনে হলো, কম্বল চুইয়ে হিম চুকচে। কম্বলের বাইরে

বিছানা-বালিশে আসন পেতেছে শুকনো হিম।

গরমের দেশে এসে এ কেমন শীতের কামড়!

কলঘোতে এখন তামপাত্রা এখানকার চেয়ে অস্ত ত ১৫ ডিগ্রি বেশি। মধ্য প্রদেশেরই ক্যান্ডিতেও এখানকার

অস্ত দিগঙ্গ। কিন্তু একই প্রদেশের এই পাহাড়ি শহরে হিম ছড়িয়ে কাবু করে ফেলেছে শীত বুড়ি। শেষতক হিটারটা চালাতেই হলো। এমন শীতের কারণেই এখানকার হোটেল-রিসোর্টগুলো রুম হিটার রাখে। এই বৈদ্যুতিক হিটারের ওমটাই একসময় ঘুমের ঘোর এনে দিলো।

শ্রীলঙ্কার শীতলতম শহরের সকালটাও শীতল। তবে হিম ছড়ানো আলোয় আরও স্পিন্ড সেন্ট এন্ড্রুস হোটেল। পাশেই চার্চ স্কুল। রেস্তোরাঁর পাশে সুবুজ ঘাসে ছাওয়া বাগান। ঘাসের ডগায় এখনো কিছু ঘোলাটে শিশির। রোদের তাড়া খাওয়ার আগে আরও কিছুক্ষণ ঘাসের ডগাতেই বুরি আসন পেতে থাকবে। বাগানে বসে নাস্তা সারতে সারতে ঘণ্টা বাজে চার্চ স্কুলে। শিশুরীদের দিন শুরুর কোরাস ভেসে আসে।

ফের পথে গড়া টুরিস্ট বাস। এই শহরে একটু দৈরিতেই ঘুম ভাঙে সুর্যের। দিনে গড়ে সাড়ে ছয়টা করে কিরণ ছড়ায়। সকাল আটটা নাগাদ পূর্বদিকের পাহাড়সারির মাথায় সূর্যটা জেঁকে বসতে শুরু করলো। শিশির ধোয়া পরিচ্ছম রাজপথে যান চলাচল বাড়ছে।

উভর থেকে দক্ষিণে ছুটছে গাড়ি। হাতের ডানে পড়ে বইলো গলফ ক্লাব। ওই গলফ মাঠের কোণায় ডইলিয়াম রজার্সের সমাধি। পাশের বাদুলো জেলার সরকারি এজেন্ট ছিলেন এক সময়। গুলি করার জন্য কুখ্যাতি কুড়িয়েছিলেন তিনি। রজার্স সাহেব অস্ত প্রচলিত নৃয়া এলিয়ায়।

স্থানীয়দের বিশ্বাস, মহাপাপের জন্য প্রতিবেচন তার সমাধিতে বজ্জ্বাত হয়। তার সমাধি তাই দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। তার সমাধিটা এখনো রাতের শিশিরে ভেজা।

হাতি হস্তারকের অভিশঙ্গ সমাধি পড়ে থাকে পেছনে। বাঁয়ে পড়ে থাকে রেসকোর্স ময়দান। তারপর গ্রেগরি পার্ক, গ্রেগরি লেক। পর্যটকদের বিশেষ বিনোদন স্পট।

গরমের দেশের শীতল শহর ছাড়ানোর পর একটু একটু করে বাড়তে থাকে সুর্যের তাপ। নুয়ারা এলিয়াও অবশ্য উঞ্চ হয়ে ওঠে দিনে। তবে যে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস,





ঘূরে আসুন ভূম্বর্গ কাশীর

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্ষ

কাশীর তার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। কাশীরকে পৃথিবীর স্বর্গ বলা হয়। তবে কেন স্বর্গ বলা হয় তা নিজ চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। চারপাশের বিশালাকার সব পাহাড়। তার ফাঁকে ফাঁকে মেঘের খেলা, সবুজ প্রকৃতি, নদীসহ বিশ্বাসকর সব দৃশ্য দেখতে পাবেন স্থানে। প্রতিবছরই লাখ লাখ ভ্রমণ পিপাসু এই স্বর্গরাজ্য কাশীরে ছুটে যায় এর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

যদি আপনি প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তাহলে কাশীর আপনার জন্য আদর্শ স্থান। স্থানে অভিবাদন জানাবে তুষারাবৃত পর্বত ছড়া, ছবির মতো উপত্যকা, নির্মল হৃদ, বিশাল বৃক্ষ এবং দোলুম্যান পুঞ্জ। ট্র্যাকিং, ভেলা ও ডিঙি নৌকায় চড়ার মত দুঃসাহসিক কাজগুলো করারও সুযোগ আছে।

কাশীর ভ্রমণকারী বিদেশি পর্যটকদের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশিরা। ভারতনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটিতে সবচেয়ে বেশি পর্যটক যায় মালয়েশিয়া থেকে। এর পরই রয়েছেন থাইল্যান্ডবাসী।

কাশীরের দর্শনীয় স্থান

কাশীরের পুরো শহরটাই যেন স্বর্গরাজ্য, দিগন্তজোড়া উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝে দেখা মিলবে সাদা বরফের খেলা। শহরের ভেতরে রয়েছে দেখার মতো নানা জায়গা। শহরের বাইরে অপেক্ষা করছে আরেক



সৌন্দর্য। কাশীরের ইয়োশমার্গ, সোনালগাহ, গুলমার্গ কিংবা পহেলাগাম ভ্রমণ স্থানের চেয়েও কম নয়।

শ্রীনগর: এটি ভারতের জন্ম ও কাশীর রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এটি বিলম নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীনগরে প্রথমেই চোখে পড়বে পাহাড়ের ছড়ায় বরফের মতো সাদা তুষার কনা। এখানে আছে মোঘল গার্ডেন, টিউলিপ গার্ডেন, হ্যারত বাল মসজিদ, ডাল লেক ও নাগিন লেক।

এর মধ্যে শ্রীনগরের জনপ্রিয় পর্যটন স্থান হচ্ছে ডাল লেক। এই লেকে হাউসবোটে থাকার অভিজ্ঞতা আপনাকে মুঝ করবে। সেই সঙ্গে শিকারায় ভেসে শপিং করতে ভুলবে না। শ্রীনগরের এই ভাসমান বাজার সতীই আপনাকে তাক লাগিয়ে দেবে। ভোরেলো ধূম থেকে উঠে শিকারায় কেনাকাটা তো করবেনই, সেই সঙ্গে ছবি তোলা ও মিস করবেন না। এছাড়া শ্রীনগর ট্র্যাকিং, পাথি দর্শন, নৌকা চড়া এবং ওয়াটার ফিল্ইংয়ের জন্য সুপরিচিত।

গুলমার্গ: কাশীরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হচ্ছে গুলমার্গ। শ্রীনগর থেকে মাত্র ৫২ কিলোমিটার দূরে সবুজ ঘাসে বিস্তৃত গুলমার্গ সারা বছরই বরফে ঢাকা থাকে। এখানে আছে পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু গলফ কোর্স যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৪০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত।

এটিকে ক্ষিয়ারদের স্বর্গ বলা হয়। মধ্য ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে ফিল্ই করা যায়। এছাড়া এখানে গড়োলা ক্যাবল কারে চড়তে

পারেবন। ক্যাবল কার ছাড়াও প্যারাগ্লাইডিংয়ে মজা পাবেন। আর দেখতে পাবেন বাবা খুফির মাজার, আফারওয়াত প্লিক, সেন্ট ম্যারি চার্চ।

পেহেলগাম: শ্রীনগর থেকে ৯৭ কিলোমিটার দূরে পেহেলগাম অবস্থিত। ট্যাঙ্কিতে করে যাওয়া যায়। এখানে দেখার মতো অনেক কিছু আছে। লিদার নদী, বেতাব ভ্যালি, চাদ্দেরওয়ারি, আর ভ্যালি, ধাবিয়ান, কাশীর ভ্যালি পয়েন্ট, কানিমার্গ ইত্যাদি। আপনি যদি মাছ ধরতে ভালোবাসেন, তাহলে লিদার নদীতে ট্রাউট মাছ ধরতে পারেন। এখানকার স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানিতে সেরা ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক পর্যটক এখানে ট্রাউট মাছ ধরতে আসেন।

এখানকার বাইসারান মিনি সুইজারল্যান্ড হিসেবে পরিচিত। জুলাই থেকে অঙ্কোরের মাঝামাঝি গেলে দেখা মিলবে আপেল বাগান। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ পাবেন গেগেলহাম ভিউ পয়েন্ট। তবে পেহেলগামে গেলে চিজ থাম দেখে আসতে ভুলবেন না। স্থানীয় ভাষায় এই বিশেষ ধরনের চিজকে বলা হয় কালারি। গোটা ভারতে এর থেকে ভালো চিজ আর কোথাও পাবেন না। তবে কাশীরের এই চিজ গ্রাম এখনো সেভাবে পর্যটকদের কাছে পরিচিত নয়।

সোনামার্গ: শ্রীনগর থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সোনামার্গে উপত্যকা ও বর্ণার দেখা মিলবে। এখানে আছে থাজিয়ান হিমবাহ। এছাড়া দেখা মিলবে সিঙ্গু নদী। রয়েছে সেজিং, স্লো বাইক ও ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ।

তবে কাশীরে গেলে সেভেন লেক ট্র্যাকিং মিস করবেন না। সোনামার্গ থেকে শুরু হয় এই ট্র্যাকিং। পুরো সেভেন লেক ট্র্যাকিং শেষ করতে আট দিন সময় লাগে। হিমালয়ের অসাধারণ দৃশ্য আপনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন এই ট্র্যাকিংয়ের পথে। এই অভিজ্ঞতা আপনি কোনো দিন ভুলতে পারবেন না। তবে সঙ্গে ট্র্যাকিং জুতা নিতে হবে।

গুরেজ উপত্যকা: শ্রীনগর থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গুরেজ ভ্যালি। এই প্রাণ্তিক এলাকায় এখনো সেভাবে পর্যটকদের ভিড় হয় না। আপনি যদি নিরবিলিতে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কয়েকটা দিন কাটাতে চান, তাহলে গুরেজ উপত্যকা অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন। কিষাণগঙ্গা নদীর ধারে এখনো ছোট ছোট কয়েকটি গ্রাম আপনাকে মুঠ করবে।

এছাড়া কাশীরে কিছু জায়গা রয়েছে শহর থেকে একটু দূরে। অনেকের কাছে জায়গাগুলো অজানা, তবে ভালো লাগার মতো। যেমন: মার্তু মন্দির। এটি শ্রীনগর থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ছোট শহর করেনাগে রয়েছে মাছ ধরার ব্যবস্থা।

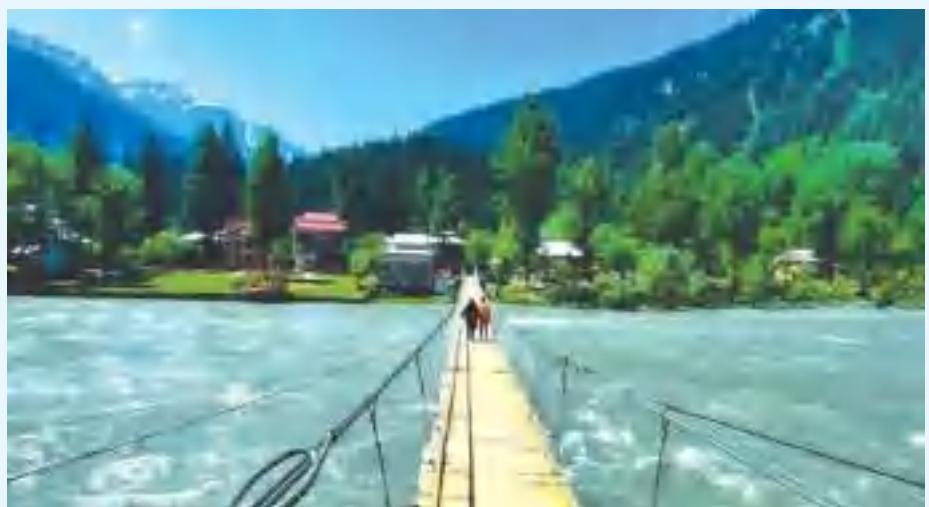
ছটপলে রয়েছে আছে কাঠাবাদাম ও আপেল বাগানের সমাহার। আরও ঘুরে আসতে পারেন নুরা উপত্যকা ও দুর্ধপতিরির মতো জায়গায়।

কাশীর ভ্রমণের সময়

কাশীরের রূপ দেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে কমপক্ষে তিনিবার- বরফ, ফল ও ফুলের মৌসুমে।

কাশীর উপত্যকায় শীত, বসন্ত গ্রীষ্ম ও শরৎ- এই চারটি খাতুই উপভোগ করার মতো। চারটি খাতু থাকলেও প্রধানত দুটি খাতুই দীর্ঘ মেয়াদী। তাহলে শীত ও গ্রীষ্মকাল।

বাংলাদেশের শীতকাল হিসেবে ইংরেজি বছরের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। এই সময় কাশীরে চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ, সাথে মোফল। এই সময় গেলে চারপাশের এক নয়নাভারাম দৃশ্য চোখে পড়বে। তবে বরফ দেখতে



হলে যেতে হবে মোফলের পর শীতকালের শেষে। এপ্রিল থেকে মে, এই সময়ে কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময়। এই সময় ফুল ভরা থাকে চারদিক, বিশেষ করে টিউলিপ ফুল ও স্বর্ণীয় সৌন্দর্য দেরি ফুল।

টিউলিপ স্বল্প মেয়াদী যা ২০-২৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত টিউলিপ গার্ডেন খোলা থাকে। এপ্রিলের শেষে সম্পূর্ণ ফুলস্ত টিউলিপ দেখতে পাওয়া যায়। এপ্রিল ও মে মাসে সাদা সাদা দেরি ফুলও ফোটে। এই ফুল দেখে শুধু মুক্ষ হয়ে দেয়ে থাকবেন।

বাংলাদেশের শরৎকাল হিসেবে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের সময়টাতে বরফ কিছুটা কম থাকে। তবে নানা ধরনের ফল পাওয়া যায় এই সময়ে, বিশেষ করে আপেল আর চীনা বাদাম।

১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বরের কাশ্মীর উপত্যকায় মাঠে মাঠে ছোয়ে যায় বেগুনি রঙের জাফরান ফুল। জাফরান ফুলের লাল পাঁপড়ি থেকে তৈরি হয় জাফরান। একে বাণিজ্যিকভাবে রেড গোল্ড বলা হয়। উন্নত জাতের জাফরান প্রেসন, ইরান ও ভারতের কাশ্মীরে উৎপাদিত হয়। আর ঐতিহ্যপূর্ণ চিনার গাছের পাতার আগুন আপনার মনে ফাগুন ধরিয়ে দিতে যথেষ্ট।

কীভাবে যাবেন কাশ্মীর

কাশ্মীর যেতে পারেন প্লেনে, ট্রেনে বা বাসে। বিমানে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রথমে দিল্লি যেতে হবে, তারপর সেখান থেকে শ্রীনগর। সেখান থেকে গাড়িতে করে কাশ্মীর।

ট্রেনে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ঢাকা থেকে মৈত্রী এক্সপ্রেস করে কলকাতা যেতে হবে। কলকাতা থেকে ৩৫-৩৬ ঘণ্টা জার্নি করে ‘জুনু’ যেতে হবে। জুনু যাওয়ার জন্য ট্রেন আছে। কলকাতার হাওড়া থেকে জুনুর উদ্দেশে ছেড়ে যায় ট্রেন। জুনু থেকে ৮-১০ ঘণ্টার সফর শেষে শ্রীনগর যেতে হবে। সেখান থেকে গাড়িতে করে পৌঁছে যাবেন কাশ্মীর। আর বাসে প্রথমে গ্রিনলাইন, সোহাগ বা শ্যামলি পরিবহনে কলকাতা থেকে জুনু গিয়ে সেখান থেকে শ্রীনগরে পৌঁছে গাড়িতে করে কাশ্মীরে যেতে হবে। কলকাতা থেকে জুনু অথবা শ্রীনগরে ডোমেস্টিক বিমানেও যেতে পারেন। ◆





ATF DHAKA 2023

THE BIGGEST EVER TOURISM EXPO IN BANGLADESH

10th ASIAN TOURISM FAIR

20 COUNTRIES 300 EXHIBITORS



September **21** **22** **23**, 2023

International Convention City Bashundhara (ICCB)
Dhaka, Bangladesh

Partners of ATF 2022

Endorsed by
 Ministry of Civil Aviation and Tourism

Supported by

Organized by
 Parjatan Bichitra

Prime Partner Country
 nepal

Partner Country
 THAILAND

Host Country

Feature Country

Airlines Partner
 Biman BANGLADESH AIRLINES

Hospitality Partner
 INTERCONTINENTAL DHAKA

Adventure Dining Partner
 FLY Dining

Cruise Partner
 DHAKA DINNER CRUISE

Entertainment Partner
 FANTASY KINGDOM

Transport Partner
 CONVOY SERVICE

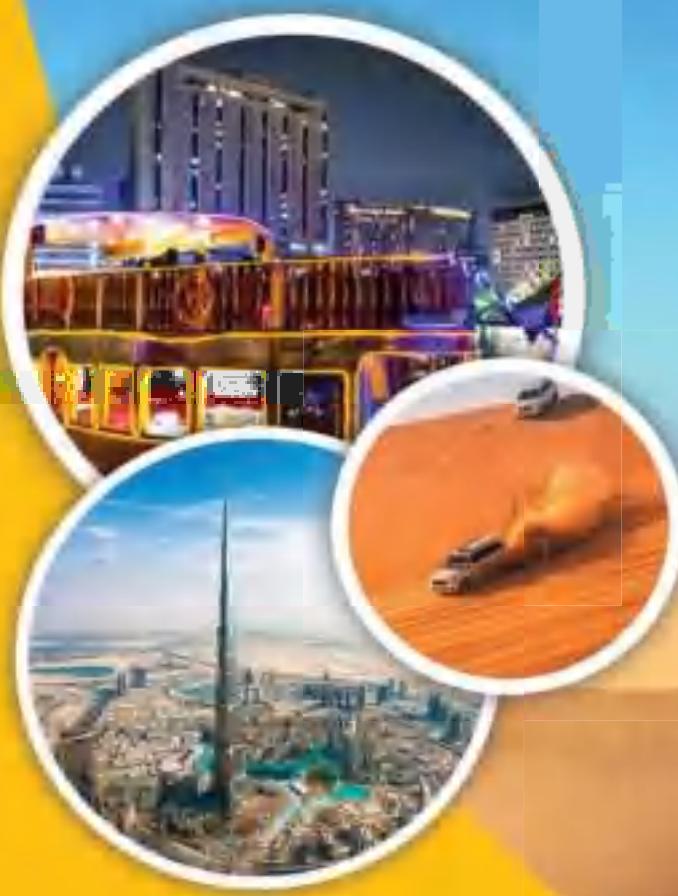
ISP Partner
 BCL

Networking Event Partner
 BOTOF

www.asiantourismfair.com



www.desertexpress.ae.com



TRAVEL WITH US UAE

BOOK YOUR TRAVEL NOW

Our Services

Visa | Air Ticket | Hotel | Meeting & Exhibition

Sightseeing | Transport

Corporate Event

Corporate Training | Documentary | Guide & logistics

Education / Medical / Migration Consultancy